KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩৪ নং নিবেদিতা লুপ্তার রোড কেস, ৩৮৮৩০০৮
Collection : KLMLGK	Publisher : মিত্রালয় প্রকাশন
Title : মরমন্ত	Size : 5.5" x 8.5" 13.97 x 21.59 c.m.
Vol. & Number : ১/১ ১/৩ ২/১-২	Year of Publication : শ্রাবণ, ১২৯৫ অগ্রহায়ণ, ১২৯৫ শ্রাবণ-শ্রাবণ, ১২৯৬
	Condition : Brittle Good
Editor : নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম, দ্বিতীয় খণ্ড পৌষ মাঘ—১২৯৬।

মালঞ্চ।

মাসিক পত্র।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

সূচী।

কলিকাতা
৩৪নং নিয়োগীপুকুর ইষ্ট লেন, তালতলা
নবজীবন যন্ত্রে
শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।

মালঞ্চের নিয়মাবলী।

১। কলিকাতা ও মফস্বল সর্ব্বত্রেই ডাকমাশুল সমেত মালঞ্চের বাৎসরিক মূল্য ২৲ টাকামাত্র। মালঞ্চের আকার—ডিমাই আট পেজি ৩২ পৃষ্ঠার ন্যূন নহে; কখন কখন ৩২ পৃষ্ঠার অধিকও থাকিবে।

২। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত কাহাকেও মালঞ্চ পাঠান যাইবে না। ছয় মাসের এক টাকা মূল্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ছয় মাসের মূল্য ফুরাইলেই বাকি মূল্য না পাইলে পত্রিকা প্রেরণ বন্ধ করিব। এক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। এক সংখ্যার মূল্য প্রদান করিলে একখানা নমুনাস্বরূপ দেওয়া যায়।

৩। বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতিপংক্তি চারি আনা—একপৃষ্ঠা আট টাকা। দীর্ঘকালের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যায়। মালঞ্চের সহিত কেহ প্রিপ বা ফর্ম্মা আঁটিয়া দিলে এক হাজার পর্য্যন্ত ৫ টাকা দিতে হইবে। এক হাজারের পর শতকরা ॥০ আনা করিয়া দিতে হইবে।

৪। নগদ টাকা, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকের ষ্টাম্প দ্বারা মূল্যাদি গ্রহণ করা যাইবে। যাঁহারা ডাকের ষ্টাম্প বা টিকিট পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে প্রতি টাকা পিছু এক আনা অতিরিক্ত ষ্টাম্প দিতে হইবে।

৫। নাম, ধাম, ঠিকানা কোন্ পোষ্ট হিয়া পত্রিকা পাঠাইতে হইবে সমস্ত গ্রাহকগণ যেন স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেন।

৬। ইংরাজি মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে মালঞ্চ না পাইলে উক্ত তারিখ মধ্যে আমাকে লিখিবেন—পরে লিখিলে কিছু করিতে পারিব না।

৭। যে কেহ দশজন গ্রাহকের অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন তিনি বিনামূল্যে এক বৎসর মালঞ্চ পাইবেন।

৮। মালঞ্চ সম্বন্ধে পত্র এবং মূল্যাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন।

৩৪নং নিয়োগীপুকুর ষ্ট্রীট লেন,
তালতলা, কলিকাতা।

শ্রীঅধরনাথ কুমার।

মালঞ্চ।

দ্বিতীয় বর্ষ।

নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন।*

(নাটক।)

সুরেশ্বর	... বৈজয়ন্তী নগরের রাজা।	হেমলতা	... ভাবী রাণী।
অজয়	... প্রমদার পিতা, রাজামাত্য।	প্রমদা	... অজয়ের কন্যা, বিনোদাসুরক্তা।
বিনোদবিহারী, বিপিনবিহারী	প্রমদার প্রণয়প্রার্থী, এবং বালসহচর।	মানদা	... বিপিনের অনুরক্তা, প্রমদার সখী, অন্য অমাত্যকন্যা।
ফুলেশ্বর	... প্রিয়বয়স্য।	অনঙ্গ	... পরীদিগের রাজা।
কানাই	... সূত্রধার।	ঋতারা	... পরীদিগের রাণী।
বামা	... স্বর্ণকার।	পঞ্চু বা পাঁচু	... পরীদিগের বিদূষক।
পদা	... তন্তুবায়।	বেলফুল, বকফুল, বকুলফুল, বেগুণফুল	...পরীবর্গ।
ছিরে	... কর্ম্মকার।		
তিনু	... কাঁসারী।		
পাঁচু	... দর্জ্জী।		অনুচরবর্গ, ইত্যাদি।

* ইহা মহাকবি সেক্সপিয়রের সর্ব্বজন-আদৃত Midsummer Night's Dreamএর অনুবাদ। অনুবাদক বঙ্গের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। কিন্তু এটী তাঁহার সুসময়ের রচনা নহে। কবি যৎকালে রোগশয্যায় শায়িত, নানারূপ মানসিক ক্লেশ ও শারীরিক যাতনায় অভিভূত, তৎকালে কথঞ্চিৎ চিত্তবিনোদনার্থে এই অনুবাদটী করেন। কবির নাম এখন আমরা বলিব না; আবশ্যক হইলে পরে বলিব। আপাততঃ বঙ্গীয় পাঠকের অনুমান-শক্তির একটু পরীক্ষা করিতে চাই।

মালঞ্চ-সম্পাদক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তীনগর—রাজবাটী।

সুরেশ্বর, হেমলতা, ফুলেশ্বর এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ।

সুরে। দেখ, প্রিয়ে হেমলতে! শুভ-বিভাবরী
আসিছে বিজলীবেগে; চারি দিন আর,
উদিবে নবীন-চন্দ্র; চারি দিন আর,
তবু মনে হয়—কত ধীরে ধীরে যেন
হইতেছে কলাহীন ওই ক্ষীণ-শশী।
বিলম্বে বাসনা, প্রিয়ে, বাড়িছে কেবল।

হেম। চারিদিন, প্রিয়তম, নিবিবে সহসা
নিশিকোলে; চারি নিশি পোহাবে স্বপনে।
তখন দেখিবে শশী—রজতের ধনু
নব-নত,—আমাদের বিবাহ-বিলাস।

সুরে। যাও ফুলেশ্বর!
ভাসাওগে রাজধানী আমোদ-সাগরে;
জাগাওগে আনন্দের মৃদুল লহরী;
বিষাদে পাঠাও বনে, অথবা শ্মশানে;
যেন কালছায়া তার না দেখি নয়নে।

(ফুলেশ্বরের প্রস্থান।)

হেমলতে, বীরবেশে সকৃপাণ করে,
লভিয়াছিলাম আমি তোমার প্রণয়,
কিন্তু তব পরিণয়, বিলাসীর বেশে
লভিব, কুসুম-দামে, আনন্দ উৎসবে।

(অজয়, প্রমদা, বিনোদ এবং বিপিনের প্রবেশ।)

অজ। সুকৃতী সুরেশ্বর দীর্ঘজীবী হউন!

সুরে। মহাত্মা অজয়ের সম্ভাষণে প্রীত হইলাম। নূতন সংবাদ কি?

অজ। মাথা-মুণ্ড! কালের বিচিত্র গতি! আমার কন্যা প্রমদার বিরুদ্ধে রাজ-সমক্ষে অভিযোগ করিতে আসিলাম। বিপিন! মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াও! মহারাজ! আমি ইহার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিতে চাই। বিনোদ, অগ্রসর হও! মহারাজ! এই দুরাচার আমার কন্যাকে কি মোহিনী করিয়াছে!—

দিয়াছে গলায় তার কবিতার মালা;
করিয়াছে বিনিময় প্রেম-নিদর্শন;
সচন্দ্র-নিশীথে মুক্ত গবাক্ষে তাহার
গেয়েছে কৃত্রিম-কণ্ঠে কৃত্রিমকামর
প্রেমের সঙ্গীত;—হায়! কল্পনা তাহার
ক'রেছে অঙ্কিত চারু সুকেশ-বলয়ে,
কোমল-কুসুম-দামে,—প্রবঞ্চনা-জালে
হরিয়াছে বালিকার কোমল-হৃদয়।

তাহাতে কন্যা আমার অবাধ্য হইয়াছে। মহারাজ! যদি প্রমদা বিপিনের সঙ্গে বিবাহে সম্মত হয়, ভাল; না হয়, রাজ্যের চির-প্রসিদ্ধ প্রথা-অনুসারে কন্যা বলক্রমে বিপিনকে কিম্বা শমনকে প্রদান করিবার রাজাজ্ঞা হউক।

সুরে। প্রমদে! তুমি কি বল? তোমার পিতার আদেশ প্রতিপালন করা উচিত; তোমার পক্ষে তোমার পিতা দেবতা এবং তোমার সৌন্দর্য্যদাতা। তুমি তাঁহার কাছে একটী মোমের পুতুলবিশেষ; তিনি তোমাকে গড়িয়াছেন, তিনি তোমাকে ভাঙ্গিতেও পারেন। বিশেষতঃ বিপিন একজন যোগ্যপাত্র।—

প্রম। বিনোদও তেমনি যোগ্যপাত্র।

সুরে। বিনোদ নিজে যোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন তোমার পিতার অভিমত পাইতে পার নাই, তখন বিপিনকেই যোগ্যতর মনে করিতে হইবে।

প্রম। পিতা যদি আমার চক্ষে দেখিতেন—

সুরে। বরং তোমার চক্ষু তাঁহার অভিমত মতে দেখা উচিত।

প্রম। মহারাজ! ক্ষমা করিবেন। আমি জানি না, আমি কি প্রকারে এত প্রগল্‌ভা হইলাম। আমি জানি না, মহারাজের সমক্ষে

আমার মনের ভাব খুলিয়া বলা আমার পক্ষে কতদূর শীলতা-সঙ্গত। কিন্তু আমি মহারাজের কাছে জানিতে চাহি, আমি বিপিনের সঙ্গে বিবাহে অসম্মত হইলে আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অমঙ্গল কি হইতে পারে।

সুরে। মৃত্যু কিম্বা তপোবন। অতএব, প্রমদে! তোমার মন পরীক্ষা করিয়া দেখ। তোমার পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে, তপস্বিনীবেশে আশ্রমের বৃক্ষচ্ছায়ায় শীতল নির্ম্মম চন্দ্রের দিকে চাহিয়া উপাসনা-গীত গাহিয়া গাহিয়া তোমার মরু-পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে।

সাধু, যারা উপেক্ষিয়া শোণিত-প্রবাহ,
এরূপে সাজিতে পারে যৌবনে-যোগিনী;
কিন্তু ধরাতলে ধন্য সেই সুকুসুম
নির্জ্জনে অনূঢ়া বৃন্তে না ফুটি, না ঝরি,
সুগন্ধমোহিত করে মানবের মন।

প্রম। তেমতি ফুটিব আমি, তেমতি ঝরিব,
নয়নাগ্র! ওরু নাহি সমর্পিব আমি,
প্রাণ নাহি চাহে যারে, প্রণয় আমার।

সুরে। সময় লও; আগামী অমাবস্যা দিন, যে দিন আমি আমার প্রণয়িনীর সহিত চির-প্রেম-পাশে বদ্ধ হইব, সেই দিন তোমার পিতার আজ্ঞার অবাধ্যতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে কিম্বা তাঁহার ইচ্ছানুসারে বিপিনকে বিবাহ করিতে অথবা করালিনীর মন্দিরে চির-তপস্যা-ব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিও।

বিপি। প্রমদে! এখনও ভাবিয়া দেখ। বিনোদ! তোমার অমূলক বিবাহ-সাধ এখনও পরিত্যাগ কর।

বিনো। বিপিন, তুমি প্রমদার পিতার ভালবাসা পাইয়াছ, তাহাতেই সুখী হও; প্রমদার ভালবাসা পাইলেই আমার যথেষ্ট।

অজ। নরাধম! ঠাট্টা করিতেছ! সত্য, বিপিন আমার ভালবাসা পাইয়াছে। অতএব যাহা আমার, আমার ভালবাসা তাহাকে অর্পণ করিবে। প্রমদা আমার, অতএব প্রমদাতে আমার যে অধিকার আছে, আমি তাহাকে প্রদান করিলাম।

বিনো। অর্থে, কি বংশমর্য্যাদায়, আমি কোন অংশে বিপিনের ন্যূন নহি। আমার প্রণয় অসীম। কিন্তু এ সকল অহঙ্কার তুচ্ছ, যখন প্রমদা আমাকে ভালবাসে। তবে আমি কেন তাহার আশা ত্যাগ করিব? আমি বিপিনের মুখের উপর বলিতেছি যে, সে নন্দের কন্যা মানদাকে ভালবাসিত এবং তাহার মনোহরণ করিয়াছিল। সেই সরলা কন্যা এখনো দেবতার ন্যায় এই কলুষিত লম্পটের উপাসনা করে।

সুরে। এই বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। প্রমদে! তুমি তোমার কল্পনাকে তোমার পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী করিতে চেষ্টা কর। এই দেশের রাজনীতি অনুসারে চলিতে আমি এক চুলও অন্যথা করিব না। মরিতে অথবা তপোবন প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হও। অজয় এবং বিপিন, আমাদের সঙ্গে আইস; আমাদের শুভ বিবাহ-সম্বন্ধে কোন বিশেষ কার্য্যে তোমাদিগকে নিযুক্ত করিব।

অজ। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

(প্রমদা এবং বিনোদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

বিনো। কেন প্রিয়তমে তব কপোল মলিন,—
সতৃষ্ণ গোলাপ কেন হতেছে বিলীন?

প্রম। সলিল-বিহনে বুঝি শুকাইয়া যায়;—
এখনি করিব সিক্ত নয়ন-ধারায়!

বিনো। একি পরিতাপ! প্রিয়ে, বুঝিতে না পারি,—
ইতিহাসে, উপন্যাসে অথবা জীবনে—
যথা দেখি, যথা শুনি, যথা পড়ি, প্রাণ,
প্রকৃত প্রেমের স্রোত বহে না সমান।
হয় ত বিভিন্ন রক্ত—বংশ প্রতিকূল—

প্রম। উচ্চে নীচে প্রেম, হায়! বিধাতার ভুল!

বিনো। হয় ত বয়স-দোষে অপাত্রে পতিত,—

প্রম। কি ঘৃণা! প্রাচীন প্রেম নবীন সহিত!

বিনো। কিম্বা প্রেম-নির্ব্বাচক বন্ধুর নয়ন—

প্রম। নরক! পরের চক্ষে প্রেম-নির্ব্বাচন!

বিনো। সমানে সমানে কিম্বা প্রেম বিনিময়
হ'ল যদি; মৃত্যু, পীড়া, বিগ্রহ অকালে
করিবে ছায়ায়, শব্দে, স্বপ্নে পরিণত।
মেঘাচ্ছন্ন-অমানিশি-বিদ্যুতের মত,
মুহূর্ত্ত ঝলসি যাহা পৃথিবী গগণ,
না দেখিতে অন্ধকারে লুকায় বদন।

প্রম। প্রেমের কণ্টক যদি বিধতার লিপি,
তবে কেন, প্রিয়তমে, হইবে অধীর?
নিশ্বাস, স্বপন, চিন্তা, অশ্রুর মতন
জানিলাম এ কণ্টক প্রেম-সহচর।

বিনো। শুন প্রমদা, এক উত্তম উপায় আছে। আমার একজন সম্পত্তি-শালিনী, অপুত্রা, বিধবা পিসী এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বাস করেন। তিনি আমাকে আপন সন্তানের মত স্নেহ করেন। সেই স্থানটী এই রাজ্যের বহির্ভূত। প্রমদা, তুমি যদি সেখানে যাইতে সম্মত হও, তবে আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি। যদি আমার প্রতি আন্তরিক প্রণয় থাকে, তুমি কাল রাত্রে তোমার পিত্রালয় হইতে গোপনে বাহির হইয়া যাইবে। নগরের অনতিদূরে বনের মধ্যে যেখানে বাসন্তোৎসব-উপলক্ষে একদিন প্রভাতে তোমার এবং মানদার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমি সেখানে তোমার প্রতীক্ষা করিব।

প্রম। প্রাণের বিনোদ, আমি অনঙ্গ-আয়ুধে,
কিম্বা সেই স্বর্ণচূড় তীক্ষ্ণতম বাণে,
কিম্বা যে অনলে জ্বলি অনঙ্গমোহিনী,
পুড়িল অনঙ্গ যবে হরনেত্রানলে,
দ্রবিল নয়নজলে পাষণ, পাষাণ,—
করিনু প্রতিজ্ঞা—কাল তোমার সহিত
নিশ্চয় সঙ্কেত-স্থানে হইব মিলিত।

বিনো। প্রতিজ্ঞা যেন মনে থাকে, প্রাণ! দেখ, মানদা আস্‌ছে।

(মানদার প্রবেশ।)

প্রম। ভাল আছ, মানদা? কোন্ দিক সৌন্দর্য্যে মোহিত করিয়া আসিলে?

মান। সৌন্দর্য্য আমার! কেন কর প্রবঞ্চনা?
তোমার সৌন্দর্য্যে কেন মোহিত বিপিন?
তব নেত্র ধ্রুবতারা; প্রভাত-কাকলি
কৃষকের কাণে কত মধুরতাময়!
তা হ'তে মধুরতর প্রমদা তোমার
বচন-সঙ্গীত; বড় সাধ মনে—শিখি
তব সুমধুর স্বর, নয়ন-সন্ধান,
সপ্রেম কটাক্ষ;—যদি সযাগরা ধরা
হইত আমার, আমি রাখিয়া বিপিনে
দিতাম সমস্ত ধরা তোমায়, সুন্দরি!
তোমার সৌন্দর্য্যে দেহ হলে পরিণত।
শিখাও—কেমনে তুমি চাহ, সুভাগিনি!
শিখাও—কি ইন্দ্রজালে বিপিনের মন
করিয়াছ আজ্ঞাধীন; শিখিব এখন।

প্রম। আমি তাহার প্রতি মুখভঙ্গী করি, তথাপি সে আমাকে ভাল বাসে।

মান। আমার হাসিতেও যদি আমি সে মুখভঙ্গীর কৌশল শিখিতে পারিতাম!

প্রম। আমি তাহাকে তিরস্কার করি, তথাপি সে আমাকে ভাল বাসে।

মান। বিধাতঃ! যদি আমি উপাসনার দ্বারাও তাহার সেই ভালবাসা পাইতে পারিতাম!

প্রম। আমি তাহাকে যত ঘৃণা করি, সে তত আমার সঙ্গ লয়।

মান। আমি তাহাকে যত ভালবাসি, সে আমাকে তত ঘৃণা করে!

প্রম। সে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা; মানদা, আমার কি দোষ?

মান। দোষ?—তোমার সৌন্দর্য্য। যদি সেই দোষ আমার হইত।

প্রম। তুমি সুস্থির হও, সে আর আমার মুখ দেখিতে পাইবে না। আমি এবং বিনোদ কল্য এখান হইতে পলায়ন করিব।
যত দিন বিনোদে না করেছি দর্শন,

ছিল এ নগরী যেন স্বর্গের মতন।
না জানি এ প্রেমে কি যে আছে বিদ্যমান,
করিয়াছে স্বর্গ মম নরক সমান!

বিনো। মানদা, মনের কথা বলিব তোমায়,
কালি নিশাকালে যবে শশাঙ্কসুন্দরী
দেখিবে রজত-মুখ সলিল-দর্পণে,
তরল মুকুতাময় করি দুর্ব্বাদল,
পালাবে বাসর ছাড়ি প্রেমিক-যুগল।

প্রম। কাননে যেখানে বোন্ তোমায় আমায়
শুইয়াছি কত দিন কুসুম-শয্যায়,
মধুমাখা মনকথা কহেছি দুজনে,
সেখানে মিলিব আমি বিনোদের সনে।
যবে জন্মভূমি হ'তে ফিরাব নয়ন,
অন্বেষিব নব দেশে নব প্রিয়জন।
বিদায়! আমার তুমি খেলার সঙ্গিনী,
কি বলিব, রেখো মনে আমায় ভগিনি,
ঈশ্বর-কৃপায় হবে বিপিনভামিনী!
বিনোদ, যুগলনেত্র রবে নিরশন,
কালি যতক্ষণে পুনঃ না হবে মিলন।

(প্রমদার গমন।)

বিনো। বিদায়, মানদা; তুমি বিপিনে যেমন
বাস ভাল, সে তোমায় বাসুক তেমন! (প্রস্থান।)

মান। পৃথিবীতে কারো অপেক্ষা কেহ কত সুখী! এই নগরীতে আমাকে সকলেই তাহার সমান সুন্দরী বলিয়া প্রশংসা করে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? বিপিন তেমন মনে করে না। যাহা সে ভিন্ন সকলে জানে, সে তাহা জানিবে না! কি আশ্চর্য্য! সে যতই প্রমদার রূপে মোহিত হইয়া ভুল করিতেছে, আমি ততই তাহার গুণে ভ্রমান্ধ হইতেছি। গুণশূন্য নিকৃষ্ট পদার্থকেও প্রেমে শোভা এবং প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া তোলে—

প্রণয় নিরখে মনে, না দেখে নয়নে;
মন্মথ চিত্রিত তাই মুদিত নয়নে।
প্রেমের নাহিক রুচি, নাহিক বিচার;
পক্ষ আছে, চক্ষু নাই,—মূরতি তাহার!
তাই বলে—প্রেম যেন বালক, সরল;
নির্ব্বাচনশক্তি তার এতই দুর্ব্বল!
দেখিয়াছিল না যবে নেত্র প্রমদার,
বিপিন বলিত—"আমি একান্ত তোমার";—
কতই প্রতিজ্ঞা যেন শিলা-বরিষণ!
প্রমদার রূপপ্রভা লেগেছে এমন
সে শিলায়, এবে তাহা জলের মতন।
আমি তাহাকে প্রমদার পলায়নের কথা বলিব, তাহা হইলে সে নিশ্চয় কাল রাত্রে তাহার অনুসন্ধানে বনে প্রবেশ করিবে; আর আমি যদি ইহার জন্যে শুধু ধন্যবাদটুকু পাই, তাহাও আমার পক্ষে বহুমূল্য। সে বনে যাইবার এবং ফিরিয়া আসিবার সময়ে আমি যে তাহাকে দেখিতে পাইব, তাহাই আমার পক্ষে এই পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তীনগরী—কানাইয়ের বাড়ী।

(কানাই, রামা, ভূতো, ছিরে, তিনু এবং পাঁচুর প্রবেশ।)

কা। আমাদের দল সব এয়েছে ত?

ভূতো। তুই ফর্দ্দমতে একে একে তাদেরে ডেকে দেখ্না।

কা। এ যে ফর্দ্দ! সব কটাই সহর-বাছা লোক। সকলে বলে যে, রাজার বিয়ে রাত্রে থিটার কর্‌বার জন্যে এমন লোক আর পাওয়া যাবে না।

ভূ। কানাই, প্রথম বল্, কি নাটক নাচ্‌তে হবে; তার পর যারা নাচবে তাদের নাম পড়িস্, তবে সে কথার যুত্ হয়।

কা। আমাদের নাটকের নাম (পড়িতে পড়িতে) "শোকাবহ হাস্যাস্পদক নটন্যাস ইন্দ্রজিতবধ।"

ভু। বড় মজার বহি। আমি ঠিক বল্‌ছি, ওতে বড় মজা আছে। এখন কানাই, তোর নাচওয়ালাদেরে ডাক্। দাঁড়াও হে, সারি করে দাঁড়াও।

কা। আমি যেমন ডাক্‌বো, উতোর করিস্।- ভূতনাথ তাঁতি।

ভু। হেঁ দে! আমার পাঠ কি বল্, তার পর আর নাম করিস্।

কা। ভুতো, তুই ইন্দ্রজিত সাজ্‌বি।

ভু। ইন্দ্রজিত কি ছিলো রে! রসিক না বিষ্কি?

কা। হাঁ রে রসিক; পিরীতের জন্য পরাণ দিছিলো।

ভু। তবে কাঁদ্‌তে হবে বুঝি? তা হলে তুই দেখিস্, আমি আসর ভাসায়ে দেব। কিন্তু বিষ্কি হলে বেশী কাঁদ্‌তে পার্‌তাম—

"যদি পাষাণে বীজ না হবে অঙ্কুর,
তবে কেন বলি তোরে দয়াল ঠাকুর।"

দেখ্‌ছিস্ কেমন রামপ্রসাদী! এখন আর বাকি সকলের নাম বল্।

কা। শ্রীরাম কর্ম্মকার।

ছি। হেথা।

কা। তুই প্রমীলা সাজবি।

ছি। সেটা কি বলরামের গোষ্ঠী নাকি?

কা। না রে, ইন্দ্রজিতের "ইস্তিরী"।

ছি। না ভাই, আমাকে মেয়েমানুষ সাজাস্ নে, আমার দাড়ি উঠছে।

কা। তাতে আট্‌কাবে না, তোর যে মুখস্ থাকবে। কুছ্ ছোট করে বল্‌বি।

ভু। যদি মুখস্ পর্‌তে হয়, তবে আমি প্রমীলাও সাজ্‌বো। আমি কুব্ ছোট ছোট বল্‌বো। "প্রমীলা প্রমীলা" "প্রাণের ইন্দ্রজিত", "তোমার প্রমীলা" "তোমার দুঃখিনী জননী।"—

কা। দূর গাধা, সীতা রামের মা নহে, মাগ। তুই ইন্দ্রজিত সাজ্‌বি, আর ছিরে প্রমীলা হবে।

ভু। আচ্ছা।

কা। বেচারাম দর্জ্জি।

বে। হাজির, কানাই।

কা। বেচারাম, তুমি ইন্দ্রজিতের দ্রৌপদী সাজ্‌বে। রামচন্দ্র স্বর্ণকার—

রা। হেথা, কানুরাম।

কা। তুমি ইন্দ্রজিতের বাবা, আমি প্রমীলার বাবা। তিনকৌড়ি কাশারী! তুমি হনুমান সাজ্‌বে, তা হলে একখানি থিটার হলো।

তি। হনুমানের পাঠ লেখা আছে? তা হলে আমাকে দেও, আমি শীঘ্র মুখস্থ কর্‌তে পারিনে।

কা। তোর শিখতে হবে না, তুই বক্তৃতা করে ফেলিস্। কারণ তোর পাঠ কেবল গজরাণ মাত্র।

ভু। আমি হনুমান সাজ্‌বো। এমন গজ্‌রাব যে লোকের পিলাই উল্‌টিয়া দেব। রাজা শুনে খোস্ হবে।

কা। তা হলে তুই এক বিট্‌কেলে কারখানা করে ফেল্‌বি। রাণী শুনে হয় ত মুচ্ছা যাবে, তা হলেই আমাদের প্রাণ লয়ে টানমান।

সকলে। তা হলে আমাদের সক্কোলের ফাঁশি দেবে।

ভু। রাণী ভয়ে রাজাকে বাপ ডেকে ফেল্‌লে ফাঁশি দেবে। কিন্তু ভয়ে যে আমি গলা এত চড়িয়ে নেব যে পায়রার ডাকে মধুর মধুর গজ্‌রাব। বুল্‌বুলের ডাকে গজ্‌রায়ে সকলের আক্কেল গুড়ুম করে দেব।

কা। তুই কেবল ইন্দ্রজিত সাজ্‌বি। রাম তোর মত আল্‌কাতরা মাখা তেলাল জোরা ছিল।

ভু। আচ্ছা, তবে তাই সাজ্‌বে। হনুমানের নেজে আগুন দিতে হবে ত? হবই হব, নেজে আগুন দিলে যে আসর পুড়ে যাবে।

কা। এই নে তোদের পাঠ; কাল মুখস্থ করে রাত্রে বনের ভেতর যাবি। সেখানে জ্যোৎস্নায় বসে মুজ্‌রো হবে, তা না হলে কালেজের যত বদ ছেলে আমাদের পেছনে লাগ্‌বে, আর সব মাটি কর্‌বে। সেই বটতলা—বুঝ্‌লি?

সকলে। আচ্ছা।

(প্রস্থান)

বিজ্ঞান—বনাম—সাহিত্য সমালোচনা।

ইয়ুরোপীয় সাহিত্যকারদিগের মধ্যে একটা বিতণ্ডা আছে। বিতণ্ডা এই যে, সাহিত্য ও সূক্ষ্ম শিল্পাদির সমালোচনা বিজ্ঞানের উপর বা বৈজ্ঞানিক ভূমিতে অবস্থিত কি না,—অবস্থিতি করিতে পারে কি না। কেহ কেহ বলেন, অবস্থিত নয়, অবস্থিতি করিতে পারে না। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন, অবস্থিত—অবস্থিতি করিতে পারে। আমরা এই বিতণ্ডা একটু বিশ্লেষ করিতে চাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে 'ভূমিকা'স্বরূপ এক-আধ কথা।

সমালোচনা—সর্ব্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল; এ কথা একটু 'প্রণিধান' করিয়া বুঝিলেই বুঝা যায়। ইহা বিতর্ক দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রমাণীকৃত; অতএব সর্ব্ববাদিসম্মত। আমরা নিজেও এ কথা সমাকরূপে আলোচনা করিয়া স্থানান্তরে বুঝাইয়াছি। কথিত কথা পুনর্ব্বার কহা কষ্টকর; পরন্তু সে এত কথা যে, তাহা কহিতে এখানে স্থানেও কুলাইবে না। অতএব এ স্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে যে, সমালোচনা হইতে জ্ঞান ও বিজ্ঞান সমুদ্ভূত; কারণ সমালোচনা ব্যতীত কোনও বস্তু ও বিষয়ের সত্তা নিরূপিত হয় না, কাযেই জ্ঞানমাত্রেই সম্ভবে না।

যাহা জ্ঞান ও বিজ্ঞান মাত্রেরই মূল, অর্থাৎ যদ্দ্বারা জ্ঞান বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং শৃঙ্খলা ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিজ্ঞান-নামে অভিহিত হয়, তাহা—সেই মূল উপায়—যে বৈজ্ঞানিক, ইহা বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞানের জনয়িতা যদি বৈজ্ঞানিক নয়, তবে তাহা কি? আর বিজ্ঞানই বা কি? বিজ্ঞান কি তবে অবিজ্ঞানমূলক। যদ্দ্বারা নিয়ম উৎপাদিত ও নিয়মিত হয়, তাহা নিজে অনিয়ম বা অনিয়মের দ্বারা চালিত, এ কথা বাতুলেরই বটে। সমালোচনাকে সাধারণতঃ বিজ্ঞান কেন, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার একমাত্র উপায় সমালোচনা;—সমালোচনা অবশ্য সিদ্ধান্ত নহে।

পরন্তু সাহিত্য-সমালোচনা তাহার প্রাথমিক অবস্থা হইতে বৈজ্ঞানিক ভূমি অবলম্বন পূর্ব্বক বহুকালাবধি চলিয়া আসিয়াছে; ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি

সৃষ্টি ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছে; সংক্ষেপতঃ, ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপক্ক ও পূর্ণ করিয়াছে। ভাষাও সাহিত্য-সমালোচনার সেই সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর অদ্যাবধি অচল অটল দণ্ডায়মান আছে, সম্ভবতঃ চিরকালই থাকিবে। কিন্তু ইহা কিছু পূর্ব্বকথা;—ভাষা ও সাহিত্য-সংগঠন সময়ের কথা।

উপস্থিত কথাটা হইতেছে—শিল্প-সাহিত্যের ইদানীন্তন কালের সমালোচনাসম্বন্ধে। প্রশ্ন এই যে, শিল্প-সাহিত্যাদির আধুনিক কালের সমালোচনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিমূলক কি না এবং হইতে পারে কি না?

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি এবং সে আপত্তির যুক্তিতর্কনিচয় উপস্থিত করিয়া তাহার বিচার করা প্রয়োজন। অগ্রে তাহাই করা যাউক।

পূর্ব্বপক্ষের কথার সারমর্ম্ম সংক্ষেপে এই যে, সমালোচনা বিজ্ঞান নহে, উহা শিল্প। উহা বিজ্ঞান নয় কেন, সে বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের প্রথম তর্ক এই যে, আধুনিক সমালোচনা সম্পাদনার্থে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। প্রস্তুত করিলেও তাহা খাটে না, টিঁকে না। টেঁকা সম্ভবই নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর নিয়ম অষ্টাদশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; অষ্টাদশ শতাব্দীর নিয়ম উনবিংশ শতাব্দীতে নাই। রুচিপরিবর্ত্তনের প্রত্যেক বায়ুভরে সমালোচনার নিয়ম এবং আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। যে নিয়ম ক্রমাগত এমন পরিবর্ত্তনশীল ও এত অচিরস্থায়ী, তাহাকে বৈজ্ঞানিক নিয়ম বলিতে পার না এবং একই নিয়মে যাহা নিয়মিত—পরিচালিত—না হয়, তাহা বিজ্ঞান পদের বাচ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয় তর্ক—ইহা প্রথমেরই অন্যতম অংশ। এই যে কাব্যশাস্ত্র আর আর শিল্পবিদ্যার ন্যায় কল্পনা-কল্পিত, কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট, উহা দৃশ্যের বা চিন্তার বা ভাবের কাল্পনিক চিত্র, হৃদয়-আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আলেখ্য। অতএব কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী দ্বারা উহা পরিমিত বা সমালোচিত হইতে পারে না। নিয়মমাত্রেই উহার অত্যন্ত অনুপযুক্ত পরিমাপক; কেন না, কল্পনা কোন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে না; কাজেই সমালোচনার কোন প্রণালীতে বিজ্ঞান-বাঁধা নিয়ম স্বভাবতই অসম্ভব; সেরূপ নিয়ম করিলে তাহা অস্বাভাবিক এবং অকর্ম্মণ্য হয়। সমালোচনাকে

এতকাল নির্দ্দিষ্ট নিয়মবদ্ধ করিয়া অস্বাভাবিক, এবং অত্যন্ত বিজ্ঞপকর বিজ্ঞান-পদবীতে রাখিবার চেষ্টা করিয়া বড় ভ্রম করা হইয়াছে।

তৃতীয় তর্কের সারসংগ্রহ এই ;—সমালোচনায় বিজ্ঞানবাদী বলেন যে, শিল্পের যদিও বিবিধ প্রণালী আছে, তথাচ সূক্ষ্ম শিল্পমাত্রেরই একই বিশ্বব্যাপক উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য—এক কথায়—সুখ-বিলাস বা আনন্দ। বিজ্ঞানবাদীর মতে সমালোচকের কর্ত্তব্য—এই সুখের ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক গতিপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্যের পরিমাণ করিয়া গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করা। যে সমালোচনা বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অবলম্বন না করে, তাহা প্রকৃত সমালোচনা নহে।

শিল্পবাদীর মতে বিজ্ঞানবাদীর প্রাগুক্ত যুক্তি অত্যন্ত হাস্যজনক। সূক্ষ্ম-শিল্পমাত্রেরই উদ্দেশ্য—মানসিক সুখ; এ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। সত্য বলিয়াই সমালোচনা বৈজ্ঞানিকসূত্রবদ্ধ হইতে পারে না। বিজ্ঞান কেবল সেই পদার্থে প্রযুজ্য, যাহা অনতিপরিবর্ত্তনশীল বা অপরিবর্ত্তনীয়, যাহা নির্দ্দিষ্ট পরিমাপ্য ও স্থির। পদার্থের এই সকল স্বরূপের ও সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক নিয়ম একবার আবিষ্কৃত হইলে তাহার আর পরিবর্ত্তন হয় না; তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সমভাবে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু এই যে "মানসিক সুখের বা আনন্দের কথা" বলিতেছ, ইহা অপরিবর্ত্তনীয়ও নয়, নির্দ্দিষ্টও নয়, পরিমাপ্যও নয়; প্রত্যুত উহা অনির্দ্দিষ্ট, অপরিমাপ্য ও অত্যন্ত চঞ্চল। উহার আকার নাই, নাম নাই। মনোবিজ্ঞান বহু পরিশ্রমে উহাকে সূত্রে আবদ্ধ করিলেও উহার প্রত্যেক অনুভূতি—প্রত্যেক আবেগই অনির্দ্দেশনীয়;—যাহা কেবল ইঙ্গিতেই প্রকাশিত হইতে পারে, কোন ক্রমে সংজ্ঞায় বা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু উহা স্বপ্নবৎ, মরীচিকাবৎ, বিদ্যুদ্বৎ দ্রুত; গণনা করিয়া হিসাবনিকাশের অঙ্কের দ্বারায় উহাকে ধৃত করা যায় না। কালিদাসের কবিতা পড়িয়া, কুমুদিনীর কোমলকণ্ঠ শুনিয়া, ও রাফেলের চিত্র দেখিয়া মনে যে আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহার একটা বাঁধাবাঁধি হিসাব দিয়া উঠিতে কে পারেন? পক্ষান্তরে হরিদ্রা চূর্ণকে মিশ্রিত করিলে রক্তবর্ণ হয়, এই বৈজ্ঞানিক বিবরণ বালকেও বিবৃত করিতে পারে।

সমালোচনা যদি বিজ্ঞান হইত ও বিজ্ঞানবৎ শিক্ষনীয় হইত, তাহা হইলে রসায়নাদি শাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানবিদ্যালয়ে শুনিয়া বা শিক্ষানবিশী

করিয়া লোকে সমালোচক হইয়া উঠিতে পারিত। বঙ্কিমবাবুর কবিতাময় গদ্য, মধুসূদনের গগণভেদী ঝঙ্কার, হেমচন্দ্রের সসার কবিতা, রবীন্দ্রনাথের সরযৎবৎ সঙ্গীত কিরূপে অনুভবনীয়? তাহা কি সূত্রে ধরিয়া মন্ত্র পড়াইয়া কাহাকেও শিখাইয়া দেওয়া যায়? ইহা ত আর স্থূলদ্রব্যের সাদৃশ্য পার্থক্য নহে যে, ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। ভাবস্রোতের মৃদু চঞ্চল স্ফুট অস্ফুট অর্দ্ধস্ফুট আবেগ-আকাঙ্ক্ষার অস্পষ্ট প্রচ্ছন্ন অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ খাস প্রশ্বাস—যাহা সিন্ধুসৈকতে বালুকণার ন্যায় সুকুমার সাহিত্যে নিক্ষিপ্ত, তাহা—কি বিজ্ঞানসূত্র দ্বারা সমালোচনা করা যায়?

পরন্তু বৈজ্ঞানিকপ্রণালী শ্রেণী নির্দ্ধারিত করে। এখন বল দেখি, শিল্পসম্ভোগজনিত মানসিক আনন্দের কিরূপে শ্রেণী নির্দ্ধারিত করিবে। কালিদাসের কবিতায় এক আনন্দ, ভবভূতিতে আর এক, ভারতচন্দ্রে ভিন্ন প্রকার,—এইরূপে আনন্দের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বৈজ্ঞানিক টিকিট আঁটিয়া দিয়া কি তাহার ভাগবিভাগ করিবে? তাহা করা কি সম্ভব? আর সম্ভব হইলেও কি সত্য ও সভ্যতা-অনুমোদিত? ইত্যাদি।

অতঃপর শিল্পবাদী নবপ্রণালীর শিল্পানুকারিণী সমালোচনা বিশিষ্টরূপে সমর্থন করিয়া বলেন যে, উহার আবির্ভাবে সমালোচনা শিল্পে পরিণত হইয়াছে এবং ঐ প্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনায় "কৃত্রিম বিজ্ঞানত্ব" লোপ পাইতেছে।

বিজ্ঞানবাদীর সহিত শিল্পবাদীর উপরি-উক্ত তর্কযুদ্ধে আমরা প্রবেশ করিব না; কার্য্যানুরোধে কথা কহিতে হইলেও ইহাঁদের কোন পক্ষের সহিত আমরা আপনাদিগকে চিহ্নিত করিব না। মোটের উপর আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিয়া ইহাঁদের নিকট হইতে বিদায় লইব। শিল্পবাদীর অনেক কথা যথার্থ এবং অনেক অযথার্থ। যেগুলি যথার্থ তাহা হৃদয়গ্রাহী, যেগুলি অযথার্থ তাহা কুটতর্কের তুফানযুক্ত হইলেও অযথার্থ। তুঁষ হইতে তণ্ডুল ঝাড়িয়া ও চিনিয়া লইতে আমাদের পাঠকগণ পারিবেন; অতএব শিল্পবাদীর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমরা করিব না। বিজ্ঞানবাদীও নিজ পক্ষ সমর্থনার্থে তর্ক তুলিয়া শিল্পবাদীর সহিত সজোরে সমুখ সংগ্রাম করিতে পারেন। যেখানে সংগ্রাম সেইখানেই সত্য ও সামঞ্জস্যের অভাব, অশান্তি ও অসিদ্ধান্ত। তর্কতরঙ্গে তুফানই উঠে, তাহাতে তৈল নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। শান্তি ব্যতিরেকে সত্য সপ্রকাশ হয় না। এত কথার মধ্যে যেটা

উচিত কথা, সেটা কিন্তু এক কথাতে বলা যাইতে পারে। ফল কথা এই যে, স্বদেশেই হউক আর বিদেশেই হউক, আধুনিক সমালোচনাপ্রণালীর এখন খুব শৈশব অবস্থা, আজও ইহার কোন অঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; ইহা এতাবৎকাল ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে আপন অবয়ব গঠন করিতেছে। দেখা যায়, যিনি বিজ্ঞানের পক্ষপাতী, তিনি ইহাকে বৈজ্ঞানিক গঠন প্রদান করেন; কেহ বা সূক্ষ্মশিল্পে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। উপযুক্ত হস্তে পরিচালিত হইলে ইহা উভয় অঙ্গেরই উপাদেয় হয়। এখনকার অবস্থা এই। ফলতঃ ইহা শৈশব ও অপরিপক্ক অবস্থা। এখনও ইহার ফলাফল ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত মত প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। বস্তুর বিশেষত্ব সম্বন্ধে মত দিতে হইলে তাহার বিকাশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। নতুবা কোন মত টিঁকে না। শিল্পেরই হউক—সাহিত্যেরই হউক—আর বিজ্ঞানেরই হউক—কোন একটা প্রণালী অপরিপক্ক হইয়া স্থায়ী ভাব ধারণ করিতে বহুকাল লাগে; সেই কালের মধ্য দিয়া অনেক গঠনপরিবর্ত্তন পার হইয়া তাহাকে চলিতে হয়। একবার ভাঙ্গে একবার গড়ে; পুনরায় ভাঙ্গে, আবার গঠিত হয়;—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

আধুনিক কালের সমালোচনা এই স্বাভাবিক নিয়মেই ফলিয়াছে; ইহার ভাঙ্গা গড়া শেষ হইবার অবশিষ্ট এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অতএব অগ্রেই ইহা সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করা যাইতে পারে? তবে শিল্পবাদী যে সমালোচনাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হইতে একেবারে বিচ্যুত করিতে চাহেন, তাহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি একেবারে উঠাইয়া দেন, সে তাঁহার চিত্তচাপল্য। এ সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল যুক্তি তাহা বিজ্ঞজন-অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না।

সমালোচনার এক সময়ের নিয়মাবলী অন্য সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হইয়া থাকে, অতএব শিল্পবাদীর মতে সমালোচনা বিজ্ঞানমূলক হইতে পারে না;—ইহা আশ্চর্য্য যুক্তি। বিশেষতঃ যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিষ্য এ কথা বলিতেছেন, ইহা অধিকতর আশ্চর্য্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নিজে কি পরিবর্ত্তনশীল নহে? এক সময়ের বৈজ্ঞানিক নিয়ম কি অন্য সময়ে পরিবর্ত্তিত হয় নাই?—হইতেছে না? ধ্রুব ফলপ্রদ গণিতবিজ্ঞানমূলক জ্যোতিষশাস্ত্রে, জড়বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় নব-আবিষ্কারের আবির্ভাব এবং আরও অন্যান্য অনেক কারণে নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন হইতে দেখা গিয়া

থাকে; তাই বলিয়া কি বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব লোপ হয়? যদি না হয়, তবে সমালোচনার নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া তাহাকে বিজ্ঞানভূমি পরিত্যাগ করিতে হইবে কেন?

শিল্পবাদীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তর্ক এই যে, কাব্যাদি কল্পনামূলক,—তজ্জাতীয় বিষয়ের সমালোচনা বিজ্ঞানমূলক হইতে পারে না; যেহেতু সেই পদার্থই কেবল বিজ্ঞানের বিচার্য্য—যাহা নিশ্চিত, নির্দ্দিষ্ট এবং পরিমাপ্য। অর্থাৎ কি না মাংস, মিঠাই, রুটি, তরকারী, চা, চিনি, টাকা, পয়সা, কোট, কোরতা ইত্যাদি স্থূলবস্তুই কেবল বিজ্ঞানের বিচার্য্য; তদ্ভিন্ন যাহা-কিছু সূক্ষ্ম, তাহাতে বিজ্ঞানের কোনও অধিকার নাই। জড়বাদীর মুখে বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা বিস্ময়কর নহে।

আমরা সপ্রমাণ বলি যে, কল্পনামূলক কাব্যাদি শাস্ত্র বা সূক্ষ্ম শিল্পকে কতকগুলা আইন-কানুনের স্থূল-বন্ধন-ভারে প্রপীড়িত করা কোনক্রমেই উচিত নহে; তাহাতে উক্ত শাস্ত্র ও শিল্পাদির সজীবতা ধ্বংস হয়। কিন্তু তাই বলিয়া অবশ্য এমন কথা বলিব না যে, কাব্যাদি শাস্ত্র ও শিল্প সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহির্ভূত। যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহির্ভূত, তাহা কি-পদার্থ, আমরা ঠাওর করিয়া উঠিতে পারি না। পরন্তু নিয়মাদির অল্পাধিক্যে আমাদিগের বিবেচনায় জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতর-বিশেষ হয় না।

স্থূল দ্রব্যের ন্যায় সূক্ষ্ম দ্রব্য—ভৌতিক পদার্থের ন্যায় আধ্যাত্মিক পদার্থ—বিজ্ঞান-বহির্ভূত নহে। জড়বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিজ্ঞান ও হৃদয়বিজ্ঞান—গণিতবিজ্ঞানের ন্যায় সাহিত্যবিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞান সম্ভবে। তাহারা বহুকাল হইতে স্ব স্ব আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া আসিতেছে। এবং সুধী-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া জীবিত রহিয়াছে। তাহারা নিজেই নিজের প্রমাণ, অতএব অধিক কথা বলাই বাহুল্য। সাহিত্যই বল, আর সূক্ষ্ম-শিল্পই বল,—যাহার যে নামই দেও, মূলত জ্ঞানবিজ্ঞানের বাহিরে কিছুই নয়। শাস্ত্র ও শিল্প মাত্রকেই কোন না কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া গঠিত হইতে হয়, নতুবা সুগঠন সম্ভবে না। এখন প্রণিধান করিয়া বুঝিলে,—সেই শৃঙ্খলাই বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা। কেন না বিজ্ঞান ব্যতীত সবই বিশৃঙ্খল। যে কল্পনার কথা পড়িয়া তুমি বিজ্ঞানকে উড়াইয়া দিতে চাও, তোমার সেই কল্পনার মূলেও জ্ঞান থাকা চাই। জ্ঞান-ও-শৃঙ্খলা-বর্জ্জিত কল্পনা বাতুলতামাত্র। কল্পনায় সৃষ্টি,—সৃষ্টিমাত্রেই শৃঙ্খলা—আছে। কবিরুক্ত

সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা আছে, শিল্পীকৃত সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা আছে। শৃঙ্খলার কারণ জ্ঞান; কল্পনার মূলে জ্ঞান না থাকিলে তাহার দ্বারা কোন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নহে। কবিকৃত সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা আছে, জ্ঞান আছে। সে সৃষ্টি সমালোচনা, শৃঙ্খলা ও জ্ঞান না থাকিলে, হয় না। বিজ্ঞান আর কিছুই নয়,—জ্ঞান ও শৃঙ্খলা। তুমি বলিবে, বিজ্ঞান শ্রেণীনির্ব্বাচন ও শ্রেণীবিভাগ করে। উত্তম কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই শ্রেণীনির্ব্বাচন ও শ্রেণীবিভাগের অর্থ কি শৃঙ্খলা নহে। শিল্পবাদী বলেন, কাব্যাদি শাস্ত্র ও সুক্ষ্মশিল্প যে আনন্দ উৎপন্ন করে, তাহার শ্রেণীবিভাগ করা কিরূপে সম্ভবে? আনন্দকে কাটিয়া কি ভাগ করা চলে? শিল্পবাদী একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, সমালোচক আনন্দের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার প্রত্যেক অংশে টিকিট আঁটিয়া দেন না যে,—এই আনন্দটুকু প্রথম শ্রেণীর, এইটুকু দ্বিতীয় শ্রেণীর, এতটা তৃতীয় শ্রেণীর ও এতটা চতুর্থ শ্রেণীর আনন্দ। আনন্দ-উৎপাদক দ্রব্যের শ্রেণীনির্ব্বাচন ও শ্রেণীবিভাগ করেন, তাহাতেই আনন্দেরই ভাগ করা হয়।

আনন্দ অখণ্ড একই পদার্থ; কিন্তু তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ আছে; এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? তাস খেলিয়া আনন্দ হয়, মাছ ধরিয়া আনন্দ হয়, কাব্যাদি পড়িয়াও আনন্দ হয়, এখন ইহারা কি সকলই এক? মহাকাব্যে যে আনন্দ, খণ্ডকাব্যেও কি ঠিক তাই? নাটকেও কি তদনুরূপ? দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া যে আনন্দ, অপ্সরীমূর্ত্তি দেখিয়াও কি ঠিক তাই? আনন্দ ত উভয়েই আছে। বেহাগ শুনিয়া যে আনন্দ অনুভূত হয়, বাহার-দ্বারা কি ঠিক তজ্জাতীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাক? অতএব দেখা যাইতেছে, সুকুমার শাস্ত্রে একাধারে ভিন্ন ভিন্ন সুরে আনন্দের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি জাগ্রত করিতেছে। এখনও কি বলিবে, ভাগবিভাগদ্বারা আনন্দ-রাজ্যে শৃঙ্খলাবন্ধন হয় না? তবে, কোন্ আনন্দ উপভোগ করিয়া কে কতটুকু কাঁদিবে, কে কতটুকু হাসিবে, কে কতক্ষণ মোহিত ও উচ্ছ্বসিত হইবে, কেই বা হইবেন না,—ইহা স্থির করা কখনও অবশ্য আবশ্যক নহে; এবং আশা করি, কখনও আবশ্যক হইবেও না।

কথা হইতে পারে,—আনন্দের অপেক্ষাকৃত স্থূল স্থূল অংশের সামুশ্যপার্থক্য দেখাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহা সূক্ষ্মতর অংশ, তাহার ব্যাখ্যা ও বিচার বৈজ্ঞানিক সমালোচক কখনও করিতে পারেন নাই, কখনও

পারিবেন না। কিন্তু তাহাতে কি সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রহিতেছে না? মানিলাম,—এখনকার বৈজ্ঞানিক সমালোচক শিল্পের যে সূক্ষ্ম অংশ দেখাইতে পারেন না, শিল্পী সমালোচক তাহা দেখাইতে পারেন, বা ভবিষ্যতে পারিবেন; কিন্তু তাহাতে কি? শিল্পী যে শিল্পচাতুর্য্যের দ্বারা সূক্ষ্ম অংশ দেখাইবেন, তাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-শৃঙ্খলা না থাকাই কি নিয়ম? যদি সত্য সত্যই এরূপ নিয়ম হয়, তাহা হইলে সে শিল্পচাতুর্য্য স্বচক্ষে না দেখিয়া আমরা কোন কথা বলিয়া উঠিতে পারি না।

আসল কথা এই যে, জড়বাদী আধুনিক ইউরোপের অনেকেই বিজ্ঞানের বড়ই সংকীর্ণ অর্থ করেন; তাঁহারা হরিদ্রা-চূর্ণক-লবণ-সোডাদি পদার্থ ভিন্ন অন্যত্র বিজ্ঞান দেখিতে পান না। বিজ্ঞান প্রয়োগও করিতে চান না। কিন্তু আর্য্য-বৈজ্ঞানিক-প্রণালী সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম পদার্থে বিজ্ঞান প্রয়োগ করে; সকল বস্তুকেই বৈজ্ঞানিক চক্ষে দেখে। এই প্রণালীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে স্থূল-মাত্রেই (যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য-প্রণালী সর্ব্বেসর্ব্বা জ্ঞান করে) অনিশ্চিত, অনির্দ্দিষ্ট ও অনিত্য। পদার্থ যত সূক্ষ্ম, ততই তাহার নিত্যতা। অতএব আশ্চর্য্য নহে যে, অনার্য্য-বিজ্ঞান স্থূল ও আর্য্যবিজ্ঞান সূক্ষ্মে প্রযুক্ত হয়। স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ব্যতীত সবই অন্ধকার। পাশ্চাত্য বলেন,—জ্ঞান শক্তি; প্রাচ্য বলেন,—জ্ঞান মুক্তি। যে দিক দিয়াই যাও, জ্ঞানের সঙ্গে যাইতেই হইবে। নহিলে সব অন্ধকার।

নন্দন কানন।*

১

দিগন্ত-ললাটপটে সাধের নন্দন বন,
আধ-আধ ঘুমঘোরে কি যেন দেখি স্বপন।
ফুটিয়াছে পারিজাত, যেন কত শুকতারা
উঠিয়াছে নীলাকাশে মাখিয়া সুধার ধারা।

২

অপূর্ব্ব সৌরভময়
কি সুখসমীর বয়!
পুলকিত মনঃপ্রাণ, সাধ যায় দেখিতে;—
কতই ফুলের গাছে
কত ফুল ফুটে আছে,
কতই হয়েছে শোভা সে ফুল-মাধুরীতে!

৩

না জানি কেমনতর
ফুলশয্যা মনোহর,
চিরফুল্ল ফুলদলে
চাঁদের হাসির তলে
কেমন ঘুমায় সুখে অমর-অমরীগণ!

---

* সাধের আসনের চতুর্থ সর্গ।

(মালঞ্চ প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ খণ্ড, ২৬১ পৃষ্ঠার পর।)

পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া প্রথম খণ্ডের নিম্নলিখিত ভুল-কয়েকটী সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। যথা,—

পৃষ্ঠা	শ্লোক	ভুল	শুদ্ধ
২৫৮	৪	উরুরেখা	তরুরেখা
২৬০	৫	ঘুমান্ত	ঘুমন্ত
ঐ	৬	ফলিত	কলিত
ঐ	৭	আনেন	আননে

সমীরণ ঝুর্ ঝুর্
স্বেদলব করে দূর,
কেমন সুরভি শ্বাস, হাসিমাখা চন্দ্রানন!

৪

কিবে মন-মুগ্ধকারী
কল্পতরু সারি সারি,
দাঁড়ায়েছে অতিথির পুরাইতে কামনা!
মধুর অমৃত ফল,
জ্যো'স্নাময় স্নিগ্ধজল,
যা চাহিবে তাই পাবে, নাই কোন ভাবনা।

৫

কিছুই কামনা নাই;
মনে মনে ভাবি তাই,
কেন বা পশিতে যাই
দেবতার ঘুমাবার আরামের মরমে?
নির্জ্জনে দাঁড়ায়ে একা
ঘুমন্তের রূপ-দেখা
দেখে, দিগঙ্গনাগণ শিহরিবে সরমে।

৬

ঘুমন্ত রূপের রাশি
নিজ তনু ভালবাসি।
দেখি ঘুম ভেঙে উঠে
কি ফুল রয়েছে ফুটে!
কি এক আলোয় গৃহ আলো হয়েছে কেমন।
আলুথালু হ'য়ে প্রিয়া
আছে সুখে ঘুমাইয়া;
মুক্ত-দ্বার-বাতায়ন,
ঝুরু ঝুরু সমীরণ,
চাঁদের মধুর হাসি
আননে পড়েছে আসি;

বিগলিত কুন্তল
কি মধুর চঞ্চল!
মধুর-মূরতি দেবী কি মধুর অচেতন!
নিমীলিত নেত্র-দুটী যেন ধ্যানে নিমগন।

৭

কপোলে কমলশোভা,
কমলার মনলোভা;
ভালে স্নিগ্ধ জ্যোতিষ্মতী
বিসাজেন সরস্বতী;
নিশ্বাসে ফুলের বাস;
অধরে জড়িত হাস;
দেখি—দেখি—যত দেখি, দেখিবার বাড়ে সাধ;
মনঃপ্রাণ স্নেহে ভোর;
নয়নে প্রেমের লোর;
ঘুমন্ত নীরব রূপে না জানি কি আছে স্বাদ!

৮

আহা, এই মুখখানি—
স্নেহমাখা মুখখানি—
প্রেমমাখা মুখখানি
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য আনি' কে দিল আমার!
কোথায় রাখিব, বল!
ত্রিভুবনে নাই স্থল;
নয়ন মুদিতে নাহি চায়;
হৃদয়ে ধরিতে না কুলায়;
প্রিয়ে, প্রাণভোরে দেখি রে তোমায়!

৯

তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই।

ভালবাসি নারীনরে,
ভালবাসি চরাচরে,
ভালবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই।
প্রেয়সী আমার—
জীবন-জুড়ান ধন হৃদি ফুল-হার—
অয়ি! প্রেয়সী আমার।

১০

কে তুমি আমার ঘরে
ঘুমাইছ অকাতরে!
প্রাণের সন্তাপ-হারী
কে নারী, চিনিতে নারি!
তোমার মুখের ভাসে
দশ দিক্ পরকাশে,
তোমারি সৌন্দর্য্যে যেন
বিশ্ব বিভাসিত কেন?
তুমিই বিশ্বের জ্যোতি;
হৃদি-পদ্মে সরস্বতী;
প্রেম-স্নেহ-ভক্তি-ভাবে দেখি অনিবার।
প্রেয়সী আমার—
নয়ন-অমৃত-রাশি প্রেয়সী আমার!

১১

ওই চাঁদ অস্তে যায়!
বিহঙ্গ ললিত গায়,
মঙ্গল-আরতি বাজে, নিশি অবসান;
উঠ, প্রেয়সী আমার!—
তোমার আনন-খানি
হেরিবারে উষা-রাণী
আসিছেন আলো কোরে, হাসিছে বয়ান;
উঠ প্রেয়সী আমার, মেল নলিন-নয়ান।

১২

ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য সেই প্রিয়া তোর প্রিয়মুখ
হৃদয়ে রয়েছে জেগে দেব-সুদুর্ল্লভ সুখ!
শচীর ঘুমন্ত মুখ দেবরাজ! দেখনি?
মহাসুখে মহীয়সী আমাদের অবনি।

১৩

যে যুগে তোমরা জাগ, সকলেরি জাগরণ;
এ যুগে নন্দনবনে সবে ঘুমে অচেতন।
আমাদের মর্ত্ত্য ভূমে
কেহ জাগে, কেহ ঘুমে;
সূর্য্য যায় অস্তাচলে, রাত্রে হয় চন্দ্রোদয়।
এ চির-পূর্ণিমা নিশি তেমন সুন্দর নয়।

১৪

সেই মুখ, শুভমুখ;
সেই সুখ, পূর্ণসুখ;
অমরের অপরূপ স্বপ্নসুখ নাহি চাই।
কে বলে?—'ধরার কাছে
কালের চাতর আছে;
কালো কালান্তক মূর্ত্তি
আচম্বিতে পায় স্ফূর্ত্তি;
রোগশোক সঙ্গে তার,
চতুর্দ্দিকে ধুন্ধুমার,
হিহি-হিহি অট্টহাসে
ঝলকে বিদ্যুৎ ভাসে;
ঘোরঘট্ট চণ্ডরব,
আতঙ্কে নিস্তব্ধ সব;
প্রভাতে তারার মত
কে কোথায় অন্তর্গত?—
এ সকল মিথ্যা কথা;
আকাশ-ফুলের লতা।
প্রেমের আনন্দধামে মরণের ভয় নাই।

১৫

নবীন-নীরদ-কায়া,
কিবে শান্তিময়ী ছায়া!
কে যেন করুণাময়ী স্নেহে কোল দিতে চায়;
ক্রীড়া করি রঙ্গভূমে
বসি বসি ঢোলে ঘুমে,
অতি শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণী আপনি ঘুমায়ে যায়।

১৬

শীতান্তে বসন্তকালে,
কচি পাতা ডালে ডালে
নূতন নধর তরু উপবন মনোহর;
নূতন কোকিল গান
পুলকিত করে প্রাণ,
কি এক নূতন প্রাণে শোনে সুখে নারীনর!

১৭

এ চিরবসন্ত কাল
তেমন লাগে না ভাল,
এরে যেন ভেঙে চুরে অন্য কিছু করা চাই।
অনন্ত সুখের কথা
শুনে প্রাণে পাই ব্যথা।
অন্-অনন্ত নরকেও ততটা যন্ত্রণা নাই।

১৮

পূর্ণ মহা মহেশ্বর,
বাক্য-মন-অগোচর;
নাহি প্রাণ, নাহি গাত্র,
সচ্চিৎ-আনন্দ-মাত্র,
কার্য্য নন্, কর্ত্তা নন্,
ভোগ নন্,-ভোগী নন্,
যোগীদের ধ্যানধন;
ভবের হাটের সেই পাগ্‌লা রতন।

হাসির ভিতরে ওর
কি জানি কি আছে ঘোর!
বুঝা নাহি যায়, তবু ভাল বাসে মন।

১৯

কেবল পরমানন্দ?
কি যেন বিষম দ্বন্দ্ব;
বিকল্প-বিহীন দশা কি জানি কেমন!
মায়া-আবরণ দিয়া
লোকচক্ষু আবরিয়া
আপনি অবোধ্য থাকা,
আপনে আপনা রাখা,
নিরলিপ্ত পাপপুণ্যে,
নিবসতি সদা শূন্যে,
সদাই কেবলি সুখ?
হা কি কষ্ট, কি অসুখ!
আলাতন—আলাতন—
ঘোরতর আলাতন,
কি বিষম আলাতন!

২০

জ্বালা জুড়াবার তরে
এলেন নন্দের ঘরে,
নব কুতূহল ভরে মুখে হাসি ধরে না।
যশোদা কতই সুখে
নীলমণি করি বুকে
চুমো খান্ চাঁদমুখে, ছেলে কোলে থাকে না।

২১

বলে—"দে না যশো' মাই!
ক্ষীর সর ননী খাই;"
কাঁদো-কাঁদো আধবাণী,
শুনে কেঁদে হাসে রাণী;

অঞ্চলে ধরিয়া মা'র স্থির বাঁধে না।
গোপাল দুলাল ছেলে রঙ্গ বিনে থাকে না।

২২

ব্রজবালকের যোটে
গোধন লইয়া গোঠে
বাজায়ে মোহন বেণু
কাননে চরান্ ধেনু।
যখন যে ফল পায়,
কাড়াকাড়ি কোরে খায়;
এ দেয় উহার মুখে,
ও পড়ে উহার বুকে,
কত কান্না, কত হাসি, কত মান-অভিমান।
কোথায় আমার হায় সেই সাদা খোলা প্রাণ!

২৩

শারদ পূর্ণিমা নিশি,
কি মধুর দশদিশি!
অনন্ত কুসুমে সাজি
হাসে কুঞ্জ, তরুরাজি।
কি যেন হরষভরে
লতা সব নৃত্য করে;
নিকুঞ্জকাননে থাকি
ডেকে ডেকে ওঠে পাখী;
অখণ্ড মণ্ডল চাঁদ,
প্রেমের মোহন ফাঁদ।
স্মরি সেই ব্রজবালা
আসি নটবর কালা
ধীর সমীরে
যমুনার তীরে,
জুড়াতে বিরহ-জ্বালা সে পুলিন-বিপিনে
আদরে বাজান্ বাঁশী
ঢালিয়া অমৃতরাশি;

মনের—প্রাণের সাধে
বাঁশী বলে "রাধে! রাধে!
কোথায় মানিনী মোর, তোমা বিনে বাচিনে,—
দেখা দাও অধীনে!"—

২৪

নানা কথা উঠে মনে,
যা'ব না নন্দনবনে।
যাই, আমি ফিরে যাই সে কমলকাননে;
দেখি গে যোগেন্দ্রবালা যোগভোলা-নয়নে।

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

মালিনীর তীর্থ-ভ্রমণ।

এত দিন ছিলাম কোথায়? পাপমুখে তা বোল্‌তে নেই, তা না ত বোল্‌তুম,—হরিদ্বার কাশী আর গয়ায় তীর্থ করিতে গিয়াছিলাম। তাই এত দিন সাক্ষাৎ পাও নাই; তা ছাড়া নিত্য বাগান দেখ্‌বার বয়সও আমার নয়। তবে যদি বল, তাতে এত বিলম্ব হবে কেন? আমি চিরকালই ভদ্র-ঘেঁশা; ভদ্রলোকে যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তখন আমাকে সকল কথা খুলে বোল্‌তেই হবে।

তীর্থে যখন মন টানিল, তখন আর মালঞ্চ দেখে কে? মা ভগবতীকে ডাকিয়া তাঁহাকেই দেখিবার শুনিবার ভার দিয়া খাস মালীর সঙ্গে রওনা হইলাম। অনেক লোকে অনেক কাজ অভ্যাসের বশ হইয়া করে; মালিটী সঙ্গে লওয়াও আমার অভ্যাস। কলের গাড়িতে না চড়িয়াই পূর্ব্ব হইতে কলের গাড়ি চড়ার অপবাদটা আমার ছিল। পাড়ার মেয়েরা ও বাছা বাছা ভদ্রলোকেরা আমাকে বলিত, "মালিনি! মালী যখন চুরোট খেতে খেতে, ধোঁ ছড়িয়ে যায় ও তুমি তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাও, আমাদের বোধ হয়,—তুমি যেন কলের গাড়িতে যাচ্ছো!" এ কিন্তু লোকের দেখ্‌বার ভুল; মালী কখন আমার আগে যাইত না, সর্ব্বদাই পশ্চাতে থাকিত। কলের গাড়ি

পিছু হটে কি না বলিতে পারিনা; যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে ভদ্র-লোকের কথাও কখন মিথ্যা নহে।

মালী কোনমতে সম্মত না হওয়ায় টিকিট কিনিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। একটী ছোক্‌রা-বাবু টিকিট দিতেছিলেন; তিনি আমার সঙ্গে বেশ চেনা-শুনা লোকের মত আলাপ করিতে লাগিলেন। আমি ত অবসর বুঝে কিছু কমাবার চেষ্টায় বলিলাম, "আমার সঙ্গীটী পুরো মানুষ নয়,—আমি ত মনিষ্যি বলেই মানি না, তা ওঁর আধা-মাশুলে হবে না কি?" বাবু তা' কোনমতেই পারিলেন না। আমি টিকিট লইয়া আঁচলে বাঁধিলাম। মালীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েদের গাড়ি চেন ত?" সে বলিল, "তুমি যে গাড়িতে উঠিবে, সেই আমার মেয়েদের গাড়ি; কলের গাড়িতে আবার মেয়েদের পুরুষদের গাড়ি কি? গরুর গাড়িই ত পুরুষদের জানি, কোন কোন ঘোড়ার গাড়ি পুরুষদের বটে, কিন্তু সব নহে; কারণ কোন কোন গাড়ি ঘুড়ীতই টানিয়া থাকে।" আমি যাহা বলি, মালী তাহাতেই বিশ্বাস করেন। আমার ভরসার উপরও তাঁর ভক্তি খুব। এ গৌরবটুকু আমি একা লইতে চাহি না; এটুকু আমার ভদ্রঘরের মেয়েদের কাছে পাওয়া! এখানে যে দিন দেখিলাম, খুদে মেয়ে লাজবালা তাহার স্বামী যণ্ড জোয়ান বীরেন্দ্রবাবুকে—অরণ্যলা-ক্রমে চপেটাঘাত করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ায় বীরেন্দ্রবাবু একটীও কথা কহিতে পারিলেন না; আর বাহ্যমণী, জামসুন্দরী ও নীরেটবালা সজোরে বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে করমর্দ্দন করিতে একটুও টলিল না, সেই দিন হইতে আমারও ভরসা বাড়িয়াছে। পথে আর বড় কিছু ঘটে নাই।

বাঁকিপুর হ'রে গয়ায় উপস্থিত হইলাম। গয়ায় পিণ্ড দেওয়া আমার বিশেষ অবশ্যক হইয়াছিল। পিতৃপুরুষের জন্য ততটা ব্যস্ত হই নাই; কিন্তু সহরের কতকগুলা গো-ভূতের জন্য ও আমার সঙ্গীটীর জন্য প্রয়োজনটা কিছু অধিক হইয়াছিল। পর দিন পিণ্ড দিতে বসিলাম। যখন কলিকাতায় থাকি, তখন চূড়ামণি-মশাইকে পূজার ফুল যোগাইতাম; তিনি মূল্যস্বরূপ আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। যেদিন অবকাশ থাকিত, শুনি-তাম। কারণ, তাহাতে আমার লাভ-লোক্‌শান সমানই; বরং লোকশানই অধিক। সে সময়টুকু বে-ওয়ারিশ গরু চৌকী দিলে অনেক কাজ হইত। চূড়ামণি-মশাই বলিতেন, "না শুনিয়া আমাকে ঋণী করিও না, নিজেও ঠকিওনা"। আমি মনে মনে জানি, ঠকাঠকির ভয় নাই; কারণ, যে ফুল দিই,

তাহা তলার-কুড়ান বাসী ফুল! টাট্‌কা ফুল ছোক্‌রা-বাবু ও যুবতীদের জন্যে রাখিতে হয়; যেহেতু আগের গুলি আমার ভরসা, আর পরের গুলি আমার আশা! ঠাকুরদের জন্য যে শুক্‌নো ফুল,—এ প্রথাটী জগতের,—আমার নয়। ঠাকুর ত আর নব্য জামাইবাবু ন'ন যে, পূজার উপকরণও তেমনি চাই! বার-মেসে আটপৌরে ঠাকুর;—ফুলও যেমনি পান, আহার-আরতীরও তেমনি ঘটা! নরমের সর্ব্বত্রই এই দশা; যতদিন চুপ করিয়া থাকিবেন, ততদিন এই হালেই কাটিবে!

তার পর যে কথা বলিতেছিলাম।—আমার চূড়ামণি-মহাশয়ের কাছে একটু-আধটু উপদেশ শোনা ছিল; আজ তাহার ফুট ধরিল। এক এক পয়সা করিয়া পিণ্ড বিক্রয় হইতেছিল, তাহা লইয়া বসিলাম। এইবার সেই কোলাহলপূর্ণ দেবস্থান যেন গভীর শান্ত অন্ধকারময় শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; চক্ষে জল আসিয়া যেন বাহ্য-আবরণ দুইয়া দিল। তখন দেখিলাম, সেই অন্ধকারে সুবর্ণ-আভা লাগিয়াছে; দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্ম্ময় ও জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিসকল সম্মুখে উপস্থিত হইল! চিনিলাম,—পিতা মাতা, স্বজন! অজ্ঞানে পিণ্ড দিলাম; পরে আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কতক্ষণে সে ভাব গেল; তখন জগতের কথা মনে পড়িল,—গোভূতের কথা মনে পড়িল। তখন আবার পিণ্ড লইয়া বলিলাম, "তোমরা এই লইয়া শান্ত হও; আর বাগানে উৎপাত করিয়া ছারখার করিও না—বাগানে আর কিছু নাই"। এতক্ষণ গদাধরের পাদপদ্মে ভাল নজর পড়ে নাই; নজর পড়িবামাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া আমার গুদাধরের পায়ের দিকে একবার চাহিলাম; দেখিলাম দুইই এক;—প্রভেদের মধ্যে এঁর মাঝে মাঝে ফাট্ ধরিয়াছে, নচেৎ দুইই সেই বলি ছলিবার ছাঁচ!

একটা কথা বলা হয় নাই। এখানে আসিয়া প্রথমে গয়ালীর পাদপদ্ম বা পদচকের পূজা না করিলে সিদ্ধমনোরথের কাছি ছিঁড়িয়া যায়। কেবল এখানে কেন? সকল দেশের সকল বাড়িরই এই নিয়ম। জমাদার-সাহেব বা দর্‌ওয়ান্‌জীকে সন্তুষ্ট না করিয়া কে কবে বড়-বাড়ির অন্দরমহলে, বাবুর বৈঠকখানায় বা আফিসে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে! থিয়েটার বা ষ্টেশনে যেমন টিকিট-ঘর আছে, এঁরাও সেই টিকিট-ঘর!

বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিলাম, কি অতলস্পর্শে ফেলিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম, লোকে

যে-সকল পিণ্ড দিতেছে, কতকগুলা লোক তাহাই তুলিয়া আনিয়া আবার বিক্রয় করিতেছে। এই রূপে একপিণ্ড শতবার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ও হাড়ির পিণ্ড মুচিতে, মুচির পিণ্ড ব্রাহ্মণে পড়িতেছে!

এস্থলে আর নয়! বাসায় আসিলাম, কিন্তু ছাড়ে কে? গয়ালী সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় না দিলে সকল কর্ম্মই ব্যর্থ হইবে! সুতরাং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইল; অর্থাৎ সঙ্গে একখানি নোট-ভিন্ন কুঁচো কাঁচা আর কিছু রহিল না। শুনিয়াছিলাম,—টাঁকশালে ঝাড়া নেয়; এখানে চক্ষুকর্ণের সে বিবাদ ঘুচিয়া গেল! কাশী যাত্রা করিলাম।

পাণ্ডা,—কথাটা শুনিলেই যেন গেঁটে বেঁটে ক্যাঁড়া পুরুষ বলিয়া বোধ হইত। কাশীতে আসিয়া বুঝিলাম,—পাণ্ডা, গুণ্ডা ও মণ্ডা একই পদার্থ; কেবল আবরণ-ভেদেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বাচ্য হইয়া থাকে। পথে ঘাটে দেব-দেবীর শিলাবৃষ্টি;—সকলের কাছে অবনত হইতে হইলে মেরুদণ্ডের মায়া ত্যাগ করিতে হয়! এ তীর্থ স্ত্রীলোকের দেখিবার নয়; তবে আমি নাকি মালিনী, তাই ছদ্মবেশে বাসাত্যাগ করিয়া পুরুষ সাজিয়া দিন কতক কাটাইয়াছিলাম! চারিদিকে নরকের কীট বেড়াইতেছে; রমণী দেখিলেই কুদৃষ্টি, ছল, বল! তাহাদের অত্যাচারে কথা কহিবার কেহ নাই। তাই বাবা বিশ্বেশ্বরকে বলিলাম, "বাবা! তোমার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গয়াতে পিতামাতার দুর্দ্দশা ত সম্ভবতঃ বাড়াইয়াই আসিয়াছি, এখানে কি নিজে ডুবিতে আসিলাম! তুমি—দেখিতেছি—সেকেলে পিলসুজ! দূর হইতে খুব নাম-ডাক; আলোকজ্যোতিও বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, কিন্তু নিজে তেল-কালী মাখিয়া দিন দিন অন্ধকার হইতেছ! তুমি ভূতনাথ, ভূতের রাজা;—গয়াতে তোমার পিণ্ড দেওয়াই উচিত ছিল!

জ্ঞান-বাণী দেখিয়া আমার অনেকটা ভরসা হইয়াছে—শুধু ভরসা কেন? একটা বিশেষ লাভও হইয়াছে। মনে মনে ভাবনা ছিল,—তীর্থ করিয়া ফিরিয়া গিয়া মালঞ্চের পুষ্করিণীটীর পানা তুলিয়া ঝালাইতে হইবে;—বড় ময়লা, বড় পাঁক! কিন্তু যে নজীর পাইলাম,—এখন সার্দ্ধ দেড়-শত বৎসর অবাধে চুপ করিয়া থাকিতে পারিব! ভয়—কেবল আশ্বাসনের আঁস্তাকুড়-পরিদর্শক-দিগের,—অবীরার নিকট যাঁহারা বীরের মত কাজ করিয়া থাকেন!

এখানে আসিয়া দশ-হাত কাপড়ে কাছা নেই এরূপ অনেক লোকের সহিত আলাপ হইল। কিছু ঘনিষ্টতার পর বুঝিলাম, তাঁহাদের অনেকেই

দায়মাল! তখন আমার চক্ষু ফুটিল, বুঝিলাম, কাশী—আমাদের কলিকাতার ধর্ম্মতলা; যেহেতু ধর্ম্মতলায় গো-হত্যার ঘটাটা কিছু ঘোরতর! বাস্তব কথা বলিতে হইলে—কাশীর রাশ-নাম, "কালামুখীর কালাপানী"।

বস্তুর উন্নত অবস্থায় মিথ্যা-সাক্ষ্য দেওয়া যাঁহাদের পেশা,—নামাবলী, তিলক, টিকী, ফোঁটা, ভস্ম, জপমালা ও বন্দেদী-ঘরের "যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য"-ইত্যাদি শ্লোকের শ্রাদ্ধ, তাঁহাদের আবরণ। কুলটার আবরণ অতিভক্তি; বকের আবরণ নিস্তব্ধতা;—সেইরূপ কাশীর আবরণ "বিশ্বেশ্বর"!

শুনা ছিল, কালীঘাটে অনেক আসন্নপ্রসবা কুমারী হইয়া থাকে; কিন্তু এখানে অন্যরূপ। বালকেরা কুমারী সাজিয়া পূজা গ্রহণ করে! যাহা হউক পাণ্ডা ভোজনের দিন আমার জ্ঞান হইল। বাদশটী লোক খাইবে,—এক বোন আটা আসিল—অবশ্য তদুপযুক্ত উপকরণও আসিয়াছিল !!!

কাশী থেকে আমি সটানে হরিদ্বারে গিয়েছিলেম। তা সে সব কথা আর বোল্‌বো কি? বড় বড় নামজাদা রায়বাহাদুরেরা যেমন একই ছাঁচে ঢালা,—সেই ঘেরাটোপ্ গায়ে, সেই মোগলাই টুপী, আর সেই তৈলাক্ত কর;—সেইরূপ সকল খ্যাতনামা তীর্থই এক!

গো-মুখী দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মালির দিকেও একবার চক্ষু পড়িল! আজ তীর্থযাত্রার এই খানেই শেষ করিলাম। কারণ রাণী-পৌত্র কলিকাতায় এসেছেন;—ফুল চাই।

তীর্থে এসে যা বুঝেছি, সেইটী বোলে বিদায় লই। তীর্থগুলি—মিউনিসিপেল আপিস; পাণ্ডা-পুরোহিত—টেক্স-দারগা; মন্ত্রতন্ত্রগুলি—বিল; দেব-দেবীগুলি—নোটীস্-ওয়ারেণ্ট; দক্ষিণাটী—ট্যাক্স। সব কথা বাড়াইতে গেলে লোকে আমাকে নাস্তিক বলিবেন; কাজেই চুপ করে থাকাই ভাল। তবে আমি শ্লোকে, এই পর্য্যন্ত জানি যে, "সর্ব্বতীর্থময়ো গঙ্গা"। মালী মানুষ হইলে তিনিই আমার সর্ব্বতীর্থ; কিন্তু তিনি তাহা নন, তাই আমি চিরকালই "গোকুলব্রত"-ধারিণী! তাহাতে যদি ফল থাকে, তাহা হইলে আমা-অপেক্ষা এ সংসারে সুখী কে? আমার ফুলও আছে, আবার ফলের আশাও আছে! আবার বঙ্গে ফিরিলাম।

হীরে।

শব্দ-শক্তি।

দিন-কয়েক পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, এক অজ্ঞাত-কুলশীল সাধু-পুরুষ আমাদিগের দেশে আসিয়াছিলেন। আমরা অনেকেই তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন না। দেখিয়াই বোধ হইয়াছিল, তিনি সংসার-নির্লিপ্ত। দেখিয়াছিলাম, তিনি নিজের আনন্দে আপনি আছেন; তাঁহার আহারাদির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতেন না। অথচ তাঁহার কোন অভাবও থাকিত না; কারণ ঈশ্বর স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াই যেন তাঁহার পরিচর্য্যায় শত শত লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজের ভাবে কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, কাহারই বিপদ-সম্পদে তিনি ক্ষুব্ধ বা পরিতুষ্ট হইতেন না, অথচ তাঁহাকে পরিতুষ্ট রাখিবার জন্য শত শত লোক ব্যস্ত ছিল। তাঁহার রসনা ভগবৎ-প্রেরিত সুধাপানে সরস ছিল। এমন মহাপুরুষকে দেখিয়া আমাদের যেমন সন্তোষ জন্মিয়াছিল, তেমন বুঝি আর কখন হয় নাই। এই মায়ামোহময় জগতে নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার সদানন্দ পুরুষের সাক্ষাৎলাভ কি অল্প পুণ্যের কথা?

দিনকতক পরে শুনিলাম, সাধু মন্ত্রসাধনে অনুরক্ত আছেন। আমরা অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া আবার তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। কি আশ্চর্য্য মন্ত্রই তিনি শিক্ষা করিতেছেন!—শুনিলে শ্রবণ আনন্দে অভিষিক্ত হয়—মন পুলকে প্রফুল্ল হয়; প্রাণ আত্মহারা হইয়া অতুল সুখে সুখী হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে শুনিতাম, মন্ত্র-সকলের অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। এখন তাহাতে কতক কতক বিশ্বাস জন্মাইতে লাগিল। যাহা শ্রবণমাত্র আমোদের লহরী আসিয়া মনঃপ্রাণ তরঙ্গায়িত করে, তাহা অপেক্ষা বিস্ময়কর আর কি আছে? শুনিয়া আসিলাম, মন্ত্র তৎকালে শুদ্ধ উচ্চারিত হইতেছে মাত্র;—ক্রমাগত উচ্চারণ করিতে করিতে মন্ত্র সজীব হইবে। বলা বাহুল্য যে, এরূপ সংবাদে আমাদের কৌতূহল শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। নির্জ্জীব মন্ত্রেরই যে ক্ষমতা দেখিয়া আসিলাম, সেই মন্ত্র সজীব হইলে তাহা হইতে আরো কত বিস্ময়কর ব্যাপারই না জানি সাধিত হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না।

দিনকতক আমরা উদ্বেগে দিনপাত করিলাম। পরে শুনা গেল, সাধুর মন্ত্র সজীব হইয়াছে। আমরা দেখিতে চলিলাম, যাইয়া বিশ্বাস হইল—মন্ত্র জীবন্ত বটে। মন্ত্রের বলে বৃক্ষের ফল, লতার ফুল, ক্ষেত্রের শস্য, জলাশয়ের জল,—সকলি তাঁহার ইঙ্গিতমত নিকটে আসিতেছে। মন্ত্রের বলে পশু, পক্ষী, মনুষ্য সকলেই বশীভূত হইতেছে। আগে আগে মন্ত্রের কথা পাড়িলে তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিতাম। উপহাসাত্মক উপমা দেখাইয়া কহিতাম, "এখান থেকে মারিলাম দড়া, দড়া গেল সেই বাসুনপাড়া।" কিন্তু এখন দেখিলাম, মন্ত্রের ক্ষমতা আছে বটে! মন্ত্রে অসংখ্য নরনারীকে যুগপৎ মুগ্ধ করা যায়। মন্ত্রে কঠিন-হৃদয়ে করুণার সঞ্চার করা যায়, মন্ত্রে কোমল-হৃদয়ে কোপের উদ্রেক করা যায়। মন্ত্রে কাছের মানুষকে দূরে পাঠান যায়, দূরের মানুষকে কাছে আনা যায়। মন্ত্রে অশান্ত মনকে শান্ত করা যায়, শান্ত মনে অশান্তি দেওয়া যায়। মন্ত্রে মানুষকে নাচান যায়, খেলান যায়, হাসান যায়, কাঁদান যায়, ঘোরান যায়, ফেরান যায়। মারণ, উচাটন, বশীকরণ—সকলি হয় মন্ত্রে। তবে আর মন্ত্রবলে কি হওয়া অসম্ভব রহিল? এমন জীবন্ত মন্ত্র যে স্বচক্ষে বারম্বার পরীক্ষিত হইতে দেখিয়াছে, তাহার কি মন্ত্রে অবিশ্বাস হয়? এরূপ মন্ত্রবলে যে ভাগ্যধর বলীয়ান্, তাহার উপর ঈশ্বরের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়াই যেন আপনা হইতে বিশ্বাস জন্মে। যে সাধুর কথা আমরা এতক্ষণ বলিতেছি, যাঁহাকে মন্ত্রবলে বলীয়ান্ দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি, অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাঁহার সহিত যখন সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন তাঁহাকে ভাল বাসিয়াই আর সকল ভুলিয়া গিয়াছেন কি না, জানি না। যাঁহারা সেই ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মহাত্মার আশ্চর্য্য ক্ষমতার দিকে কখন কখন লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাঁহারাই বোধ করি, আমাদের কথায় অনুমোদন করিবেন।

উক্ত সাধু-পুরুষকে সকলেই যে জানেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার নাম করিতে আমাদের ভয় হয়। পাছে নাম করিলে অনেকের মন হইতে পবিত্র ভাবের হ্রাস হয়। পাছে নাম করিলে মন্ত্রের অমান্য হয়!

তিনি অপর কেহ নহেন, মানবের বাল্যমূর্ত্তি। সে মন্ত্র অপর কিছুই নহে, বাক্‌শক্তি। প্রফুল্ল ফুলের আধ-ফোটা সৌরভের মত শৈশবে শিশু-মুখের আধফোটা কথাগুলি যাহার শ্রুতিপথে আসিয়াছে, সেই স্বীকার করিবে,—কৈশোরে বাক্‌শক্তির উদ্ভব কি রমণীয়তাই বৃদ্ধি করে! শিশু কবে

আধ-আধ কথায় মনোভাব জানাইতে পারিবে, এই ঔৎসুক্য যে হৃদয়কে কত আলোড়িত করে, তাহা সকল জনকজননীই অবগত আছেন। কুমার কথা কহিতে শিখিল, শ্রোতৃবর্গের মনপ্রাণ হরিল; কিন্তু তখনও তাহার কথাগুলির প্রয়োগ শিক্ষা হয় নাই, যেন মন্ত্রগুলি সজীব হয় নাই। ক্রমে ক্রমে প্রয়োগ শিক্ষা হইল, তখন মুখের কথায় মনোভাব প্রকাশিত হইতে লাগিল, এক মনের সহিত আর এক মনের আলাপ হইবার—এক প্রাণের সহিত আর এক প্রাণের মিলন হইবার উপায় হইল। বাক্‌শক্তি না থাকিলে এমন সাধন আর কি হইত? নয়নে নয়নে মিলিলে মনোভাবের বিনিময় হয় বটে, কিন্তু তাহা কত সীমাবদ্ধ! বাক্‌শক্তির ক্ষমতা অসীম। এই বাক্‌শক্তির প্রয়োগ প্রশস্ত করিবার নিমিত্ত আমরা বর্ণমালার উদ্ভাবন করিয়াছি। কিরূপ চিহ্নে কোন্ বাক্যের পরিজ্ঞান হইবে, তাহা ঠিক করাই আমাদের লেখাপড়া। কবে কে তাহার দুঃখের কাহিনী লিখিয়া গিয়াছে; তাহার পর শতাব্দী হইতে শতাব্দী, কত সুখদুঃখের পসরা কত নর-নারীর হৃদয় দিয়া বহাইয়া গিয়াছে, আজ সেই দুঃখের কাহিনী পড়, তোমার চক্ষে জল আসিবে। আমরা অভ্যস্ত বলিয়া হয় ত এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপারকে অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করি, কিন্তু একবার যদি কিছু অনুধাবন করিয়া দেখি, তখনি আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হইবে।

মনে কর, তুমি এবং অপর একজন বিদেশী একত্রে কোনস্থলে যাইতেছ; এমন সময়ে একজন আগন্তুক আসিয়া কহিল, "পিপু-টমা!" তোমার সহচর অমনি উন্মনা হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কোন কথাবার্ত্তা আর কহিলেন না, তাঁহার মুখে বিমর্ষভাবের চিহ্নসকল প্রকটিত হইল। এরূপ ঘটনা ঘটলে তোমার কি মনে হয়? তুমি কি ভাব না যে, ঐ অক্ষর-চতুষ্টয়-সম্বলিত বাক্যেরই কোন এমন মোহিনীশক্তি আছে, যাহাতে তোমার সহচরের চিত্ত-বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকিবে। ঐ বাক্যেরই অবশ্য কোন বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে যে, কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন মহান্ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছে। যদি বাস্তবিকই উক্ত শক্তি থাকা সম্ভব হয়, তবে কি তুমি উহাকে মন্ত্র নামে অভিহিত করিতে পার না? যদি মন্ত্রেরই ক্ষমতা থাকিবে, যে শুনিবে তাহারই ত মন্ত্রফল উপলব্ধি হইবে; তবে তোমার কোন চিত্তবিকার উপস্থিত না হইয়া কেবলমাত্র তোমার সহচরের কেন হইল? তাহার

উত্তর—তোমার সহচর সাধনা করিয়াছেন, তুমি তাহা কর নাই। মন্ত্রসাধনা করা অমনি হয় না। গুরুমুখে শ্রবণ করা চাই, তবে মন্ত্র ফলপ্রসব করে। যে মন্ত্রে যে অনধিকারী, তাহার পক্ষে সে মন্ত্র কার্য্যকরী হইতে পারে না। রাজা জনক বশিষ্ঠের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি উপায়ে মুক্তিলাভ হইতে পারে? বশিষ্ঠদেব প্রত্যুত্তরে কহিয়াছিলেন, "এক দিন তুমি একাকী আমার নিকটে আসিও।" কথাটা আমরা অনেকেই মহাভারতে পড়িয়াছি, অনেকবার শুনিয়াছি, অনেকবার গল্প করিয়াছি, কৈ আমাদের ত কিছুই বিশেষ লাভ হয় নাই. কিন্তু রাজা জনকের পক্ষে ঐ বাক্যই মহামন্ত্র হইয়াছিল। তিনি যে দিন বশিষ্ঠদেবের নিকট উপদেশ গ্রহণার্থ গমন করিতে উদ্যোগী হইলেন, সেই দিন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে, তাঁহার উপর একাকী যাইবার আদেশ আছে; এই একক হইবার চেষ্টাই তাঁহার মোক্ষ-লাভের কারণ হইল। তাই বলি, মন্ত্রবীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র আবশ্যক।

এক জন পুণ্যবানের গল্প শুনিয়াছিলাম যে, তিনি এক দিবস সন্ধ্যা-কালে বাটীতে আছেন এমন সময় কোন ধীবরকন্যা আসিয়া তাহার বিক্রীত মৎস্যের অর্থ শীঘ্র শীঘ্র পাইবে ইচ্ছা করিয়া কহিল, "বেলা যে গেল গো!" কথাটা পুণ্যবানের কাণে গেল, তিনি তদ্দণ্ডে সংসারের মায়া কাটিলেন এবং বৈরাগ্য-পথের পথিক হইলেন। তাঁহার পক্ষে কি ঐ চিরশ্রুত পুরাণ "বেলা যে গেল গো" কথাটি মহামন্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে বলিলে যুক্তিসঙ্গত হয় না? তন্ত্রে শুনিয়াছি,—একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, ত্র্যক্ষর প্রভৃতি নানাবিধ মন্ত্র আছে, যে-গুলি সাধনা করিলে এবং সুপাত্রে পড়িলে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল প্রসব করে। ফলাফল যে পাত্রসাপেক্ষ ও সাধনা-সাপেক্ষ তাহা কে না স্বীকার করিবে?

তাই বলিতেছিলাম যে, পূর্ব্বকার অপরিচিত শব্দ "পিপু-ইমা?" যাহা তোমার সহচরের কর্ণপথারূঢ় হইয়া তাঁহাকে বিমনা করিয়াছিল, তাহার হয় ত উচিত প্রয়োগ হইয়াছিল। বাস্তবিকও কথাটার ওরূপ ক্ষমতা থাকা সম্ভব; তোমার সহচর হয় ত মিকির-ভাষা জানিতেন। উক্ত ভাষায় "পিপু-ইমা?" কথার অর্থ—'ঘুম কি ভাঙ্গিল?'

আমরা যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়া পরস্পরের মনোভাব জ্ঞাপন করি, পরস্পরের সাহায্যদানে অগ্রসর হই, পরস্পর মিলিত হইয়া কাজকর্ম্ম করি,

সে সকল বাক্যের অর্থবোধ যাহার পক্ষে অসম্ভব, তাহার পক্ষে মুখের কথায় কাজ হওয়া কি অল্প বিস্ময়কর!

শুনা গিয়াছে,—কোন এক বর্ব্বর সম্প্রদায়কে লইয়া এক সাহেবকে কাজ করিতে হইত। সাহেব লেখা-পড়া জানিতেন; তাঁহার পত্নী গৃহে থাকিতেন, সাহেব দূরে কর্ম্মস্থলে আসিতেন। এক দিবস সাহেব কোন-একটী যন্ত্র বাড়ীতে ভুলিয়া আসিয়াছিলেন, কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়া উক্ত যন্ত্রের আবশ্য-কতা হইল। কি করেন, সেই বর্ব্বরজাতিরই এক জনের হস্তে একটু কাগজে যন্ত্রের কথা লিখিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন, 'এই কাগজ খানা বিবিকে দেখাইলে তিনি যে যন্ত্র দিবেন তাহা লইয়া আইস।' বর্ব্বর শুনিয়া অবাক! সে দেখিল, কাগজে কি দুই চারিটা কাল আঁক্ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে যন্ত্রের চিহ্নমাত্রও নাই। সে অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, যদি কোনরূপে আঁক্‌গুলা দেখিয়া যন্ত্রের মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম হয়। কোন রূপেই হইল না। তখন তাহার মনে হইল, সাহেব হয় ত তাহার সহিত কৌতুক করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক সে সন্দিগ্ধচিত্তে কাগজখানি হাতে করিয়া সাহেবের বাটী পর্য্যন্ত গমন করিল এবং বিবিকে ঐ কাগজ দেখাইল। বিবিও পড়িতে জানিতেন, তিনি কাগজ পড়িয়া আবশ্যকীয় যন্ত্র বাহির করিয়া দিলেন। বর্ব্বর বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া রহিল। কাল আঁকের এত ক্ষমতা কি রূপে আসিল, সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে ত কতবার কত আঁক পাড়িয়াছে, কত বড় বড় আঁক পাড়িয়াছে, সেই আঁকও কত লোক দেখি-য়াছে, কৈ তাহারা ত কখন কিছু বুঝে নাই। আর সাহেবের দুই চারিটী সরু সরু আঁক এমন অসাধ্য সাধন করিল, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। আঁকে যে কথা বহন করে, তাহা কোনরূপেই তাহার মনে আসিল না। সে সেই লিপিখণ্ডকে এরূপ অসামান্য পদার্থ বলিয়া স্থির করিল যে, বিবির নিকট হইতে তাহা চাহিয়া লইল। আবার উপর্য্যুপরি পর্য্যবেক্ষণ করিল, শেষে স্বর্গণের নিকট যাইয়া বিস্ময়ের কথা জানাইল এবং বিস্ময়োৎ-পাদী পত্র-খণ্ড দেখাইল। তাহাদের মধ্যে একটা অঙ্কুত হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সাহেব তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, আশ্চর্য্য কিছুই নহে; তাহারা বুঝিল না।

বর্ব্বরজাতির মধ্যে বর্ণমালা ছিল না; বর্ণসমষ্টিতে কথার কাজ করে, তাহা তাহারা জানিত না, তাই হঠাৎ বর্ণপ্রয়োগের ফল দেখিয়া অত বিস্ময়ান্বিত

হইয়াছিল। অভ্যাস আমাদিগের নিকট হইতে সে বিস্ময় অপহৃত করিয়াছে। শব্দের শক্তি যথার্থরূপ অনুধাবন করিতে যদি ইচ্ছা হয়, তবে মনে মনে এমন একটা সমাজ গঠন কর, যেখানে কেহ বাক্যের ব্যবহার জানে না। সেখানে যদি কোন দুই জন বাক্‌শক্তিমান্ গমন করে, তাহারা কি উক্ত মূক সম্প্রদায়ের অন্ন বিস্ময়ের কারণ হয়? কে জানে, নব-জাত শিশুর মনোভাব কি? সে যখন দেখে তাহার ক্ষুধার সময় ক্রন্দন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, অথচ আর সকলে ক্ষুধা পাইলে কিরূপে ওষ্ঠাধর সঞ্চালন করিয়া কি করে, অমনি ক্ষুধার শান্তি নিকটে আসে। শিশু হয়ত তখন বোঝে না যে, ঐরূপ ওষ্ঠাধর সঞ্চালন আর কিছুই নহে, শুদ্ধ একটা ছোট কথা বলা—"ওগো, আমার ক্ষুধা পাইয়াছে"। শিশু হয়ত ঐরূপে ওষ্ঠাধর সঞ্চালন করিতে, যাহাতে না কাঁদিয়াও আহার মিলে সেরূপ করিতে, কত চেষ্টা করিয়াছে, অথচ সফল হয় নাই। যাহাদের চেষ্টা সফল হইতেছে, তাহাদের দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে। আমরা ফিপ্রহস্ত বাদকদিগের বাদ্যযন্ত্রবাবহার দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করি, শৈশবে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন বয়স্কদিগের শব্দোচ্চারণ শুনিয়া হয়ত সেইরূপ কি ততোধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি; কিন্তু হায়! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস আসিয়া আমাদিগের নিকট হইতে সে বিস্ময় কাড়িয়া লইয়াছে; জানি না, ইহাতে উন্নতি হইয়াছে কি অবনতি হইয়াছে। বাল্যকালে বিশ্বাস হইত, গাছের মাথা ছাড়াইলেই তাহার উপর স্বর্গ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে মোহন বিশ্বাস গিয়াছে। এখন জানিতেছি, আপাতক ত মস্তকের উপর অনন্ত আকাশ! সেই আকাশ ছাড়াইয়াও স্বর্গ মিলে কি না! কে জানে, ইহাতে আমরা লাভবান্ হইয়াছি, কি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। যাহা যায়, তাহা আর আসে না। মহানেরও নূতনত্ব যায়; অত্যাশ্চর্য্যেরও আশ্চর্য্যত্ব যায়;—এ পোড়া জগতের এই নিয়ম। অতুল আলোকমালার আকর সুবৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল, কি নক্ষত্র-চন্দ্র-খচিত সুনীল অম্বর লোকের তত বিস্ময়োৎপাদন করিতে দেখা যায় না, যত মানুষে-বানান প্রদীপমালা, কি গ্যাসের আলো-ভরা নলের সাজ, কি অকিঞ্চিৎকর বৈদ্যুতিক আলো ঝাঁকে ঝাঁকে লোকের দর্শনস্পৃহা উত্তেজিত করে। যাহাকে আমরা চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি, কাজেই তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে;—এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বাক্‌শক্তিও আমাদের নিকট বড় একটা আশ্চর্য্যভাব আনে না। কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহার আদর কখন কমিবে? কথায় চিরকাল জগতে ক্ষুদ্রবৃহৎ

শত শত ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে। কথায় না হয় কি? কথায় মানুষ বশীভূত হয়, কথায় মানুষ উত্তাক্ত হয়, কথায় অশান্তির শান্তি হয়, শান্তির অশান্তি হয়; কথায় চক্ষে জল আনা যায়, কথায় চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করা যায়; কথায় মানুষ বাঁচে, কথায় মানুষ মরে। তাই বলি, কথা মানুষের মহামন্ত্র। ঈশ্বর যত ভাল জিনিষগুলিই সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। সূর্য্য পুণ্যাত্মা পাপাত্মা সকলকেই আলো দিবার জন্য নিযুক্ত আছে; বৃষ্টি শস্যের মূলও যেমন অভিষিক্ত করে, কণ্টকের মূলও তেমনি আর্দ্র করে। সেইরূপ বাক্‌শক্তিও সাধারণের ভোগ্য করিয়াছেন। যে বাক্‌শক্তির অসাধ্য বল, তাহা সত্যপ্রিয়ের মুখেও যেমন দিয়াছেন, কণ্টকের ওষ্ঠাধরেও তেমনি দিয়াছেন। কিন্তু এমন মহামূল্য রত্নের যোগ্যপাত্র যদি কেহ থাকে, তবে সে সাধুপুরুষ। তাই কথা এত মিষ্ট হয়—বালকের মুখে। অহো, কি আক্ষেপ! এমন মহামন্ত্রও অপাত্রে পড়িয়া শত শত বিষময় ফল প্রসব করিতেছে!

কবি-কুটীর।

বুঝিয়াছি।

১

বুঝিয়াছি—
বৃথা যত্ন—বৃথা চেষ্টা—বৃথা কাঁদে মন,
এ জনমে এ বাসনা হবে না পূরণ!
অনন্ত আকাশে শশী,
কি বিশ্বাসে আছি বসি?
আমি মূর্খ, মোহে অন্ধ—ভুতলে বামন!
দূর জলদের গায়,
বিদ্যুৎ বিকাশ পায়,
মতিচ্ছন্ন ময়ূয়ের বৃথা আকিঞ্চন;—
এ জনমে এ বাসনা হবে না পূরণ!

২

বুঝিয়াছি—
হবে না পূরণ আশা এ জনমে আর ;
অতল সরসী জলে
ছেরি হেম শতদলে,
লভিতে বাসনা কেন না জেনে সাঁতার ?
দেবতার সুধা যাহা,
মানবে পাবে না তাহা ;—
এ জনমে এ বাসনা নহে পূরিবার !
বৃথা যত্ন—বৃথা চেষ্টা—দুরাশা আমার !

৩

বুঝিয়াছি—
উদ্দাম উন্মাদ আমি—হৃদয় দুর্ব্বল ;
সামান্য বাতাসে হায়,
ওই পল্লবের প্রায়,
একটু বাসনাভরে করি টলমল !
যাহা না হইবে কভু,
তা'তে অভিলাষ তবু !
কেন মৃগতৃষ্ণিকায় মিছে চাহি জল ?
বৃথা যত্ন—বৃথা চেষ্টা—হবে না সফল !

৪

বুঝিয়াছি—
এ দেহ চিতায় ভস্ম হইবে যখন,
বুক-ভরা এ পিপাসা,
এ অপূর্ণ ভালবাসা,
একটি চুম্বন তরে ভরেনি যে মন,
তাহাও হইবে ছাই,—
যে হৃদয় ভরে নাই
একটী মুহূর্ত্ত তরে পেয়ে আলিঙ্গন !
বৃথা যত্ন—বৃথা চেষ্টা—বৃথা কাঁদে মন !

৫

বুঝিয়াছি—
সরসী-সোপানে সেই প্রতিমা সুন্দর,—
হইল প্রভাত কিবা,
ভূতলে স্বর্গের দিবা,
উজলিয়া হৃদয়ের রক্ত-সরোবর !
মিশিল কুন্তলে তার,
প্রাণের এ অন্ধকার,
হাসিল সে উষা-রাণী, আজি দু'বছর
বুঝি নাই ;—বুঝিয়াছি এত দিন পর !

৬

বুঝিয়াছি—
নিরখি সে দেবমূর্ত্তি—কিরণ উজ্জ্বল,
যেন মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে,
যেন কত ভয়ে ভয়ে,
যেন কি অজানা-ভাবে হইয়ে বিহ্বল,
আপনি সাধিয়া হায়,
অর্পিলাম তার পায়
প্রাণ—মন—এক বিন্দু নয়নের জল !
বুঝিয়াছি,—যাহা দিছি সকলি বিফল !

৭

বুঝিয়াছি—
নহে সে প্রসন্না দেবী মম তপস্যায় ;
অগ্রাহ্য চরণে তার
ক্ষুদ্র প্রাণ-উপহার ;
ও প্রতিমা সুররাণী চাহে না ঘৃণায় !
দেবর্ষি রাজর্ষি কত
নিত্য তার ধ্যানে রত,
চরণে সহস্র স্বর্গ পুণ্যবান পায় !
নহে সে প্রসন্না দেবী মম তপস্যায় !

৮

বুঝিয়াছি—
বুঝিয়াছি মিছা আছি তাহার আশ্বাসে ;
প্রাণের প্রাণের মত,
তারে ভাল বাসি যত,
হায়রে পাষাণী সেই,—সেকি ভালবাসে ?

করুণা-মমতা-হীন,
জানিনি কি এত দিন ?
তথাপি রয়েছি কেন তাহার আশাসে ?
বুঝিনি কি সে পাষাণী কারে ভালবাসে ?

৯

বুঝিয়াছি—
সকলি বিফল মোর ;—তথাপিও হায় !
সেই চিন্তা অবিশ্রাম,
সে ভাবনা অবিরাম,
কাঁদিয়া জাগিয়া উঠি গভীর নিদ্রায় !
কে যেন সে নিদ্রাবেশে,
বুকে লুকাইয়া এসে,
প্রাণের পাষাণ ছবি তুলে নিতে চায় ;
বুঝিয়াছি,—কাঁদি কেন গভীর নিদ্রায় !

১০

বুঝিয়াছি,—এ রোদনে নাহি কোন ফল,
আরো যা বুঝেছি হায়,
তা' কি আর কহা যায় ?
বলিলে পাষাণ না কি হইবে তরল ?
কেবল প্রাণের জ্বালা,
বুকের এ ভাঙ্গা ডালা,
ঠেলিয়া ফেলিয়া আরো হইবে প্রবল ;
এ রোদনে এ প্রণয়ে নাহি কোন ফল !

১১

বুঝিয়াছি—
বৃথা যত্ন—বৃথা চেষ্টা—বৃথা কাঁদে মন !
এ জনমে এ বাসনা হবে না পূরণ !
বুক-ভরা এ পিপাসা,
এ অপূর্ণ ভালবাসা,
একটী চুম্বন তরে ভরেনি যে মন,
এক সঙ্গে হবে ছাই,
যে হৃদয় ভরে নাই,
একটী মুহূর্ত্ত তরে পেয়ে আলিঙ্গন !
এ জনমে এ বাসনা হবে না পূরণ !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ফল্গুতীরে।

কে তুমি মা, স্রোতস্বিনি !
নীরব নিথর ভাবে, অনন্ত সময়স্রোতে
ভাসা'য়ে দিয়াছ ক্ষীণ
অবসন্ন তনুখানি ?
নাহি(ক) তরঙ্গ রঙ্গ, বিবশ বিকল অঙ্গ,
উভধারে অশ্রুকণা,—
চলিয়াছ একাকিনী ?

২

তীরে তব, তরঙ্গিণি,
রামশিলা, প্রেমশিলা, সারি সারি শৈলমালা,
বিরাজে বিষম দর্পে,
বিশ্বরূপা ব্রহ্মযোনি ;—
তুমি, মা, বিষাদভরে, নরমের স্তরে স্তরে,
লুটিয়া তা'দের পায়,
কি গায়ি'ছ, বিষাদিনি !

৩

কেন, মা ! হাস না তুমি ?
ফুট-ফুট হাসে ফুল, মিটি-মিটি তারাকুল,
হেরিয়া পূর্ণিমা-শশী
হাসে কভু নিশীথিনী,
নীলিম নীরদ গায়, দামিনী হাসিয়া যায়,
উত্তাল তরঙ্গ তুলি'
হাসে নাচে কল্লোলিনী ;—

৪

হাস-হাস মুখখানি
সুধু মা তোমার নাই ;—কাতরে সুধাই তাই,
কা'র লাগি কোন্ ভাবে
কাঁদ' সদা, কাঙালিনি ?—
কেন প্রাণ ধূধূ বয়, অসম্পূর্ণ মরুময়,—
অবিরল নিরবাশ্রু
কেন ঝরে নির্ঝরিণি ?

৫

পুরাণে, মা, হেন শুনি—
বক্ষে তব অগণন দুঃখী তাপী পাপী জন

নামা'য়ে পাপের ভার
পায় বিভূ-পা-দু'খানি ;
পাপের বালুকা তাই উপরে দেখিতে পাই,
কিন্তু তব পুণ্য-স্রোত
অন্তস্তল-প্রবাহিনী।

৬

কি লাগি, মা, নাহি জানি—
মাখি' তব বালু' পিও, 'আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত'
উদ্দেশে ঢালিয়া দেয়
আকুলি-বিকুলি প্রাণী ;
কি স্মৃতি জাগাও তায়, বল, বল, মা, আমায়,—
তুমি, কি মা, মর্ত্ত্যভূমে
অস্ফুট স্মৃতির খনি ?

৭

কি শুনি, মা, সুধাধ্বনি !—
মরমের মধ্য হ'তে কি অস্ফুট রব ওঠে !
ভাষায় ও ভাষাজ্ঞান
হয় না যে, সুভাবিণি !
কেবলি যে কুল-কুল, কল্পনায় নাহি তুল',
কি জানি কেমন-ধারা
আধ-আধ ওই বাণী !

৮

প্রাণ কাঁদে, পাগলিনী !—
বক্ষে তব রাশি রাশি, অনন্ত তরঙ্গে ভাসি',
বিস্মৃতির অন্তরালে
বিলুপ্ত হয়েছে প্রাণী ;—
ব্যাস-বুদ্ধ-পাতঞ্জল-জ্ঞান-মৈত্রী-যোগফল
নিষ্ফল,—নিস্তেজ আজি
'বাল্মীকি-প্রতিভা'-বাণী ;—

৯

রত্নপ্রসূ ছিলে তুমি ;—
বীর-কুল-ধুরন্ধর, কবিতা-কোবিদবর,
সাধুপুত্র এবে সব
গো'ছে ছাড়ি' আর্য্যভূমি ;—
আশা, সুখ, সাধ যত সকলি হ'য়েছে হত ;—
তাই সে পাগলপারা
ব্যাকুল পরাণধানি।

১০

কাঁদ, কাঁদ, অভাগিনী !
তুমি যে, মা, পরাধীনা,—নীরব রোদন বিনা
কি সুখ-সম্বল আর ?
কে শুনা'বে আশা-বাণী ?
অতীতের স্মৃতি ভরে, ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে,
ভাসা'য়ে ভারত-বক্ষঃ
কাঁদ, সতি, দিবা-যামী'।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

স্তোত্র।

অনাদি অনন্তদেব হে মঙ্গলময়!
অসীম সৌন্দর্য্যপূর্ণ সুচারু এ বিশ্ব
তোমারই প্রতিকৃতি,—পূর্ণ মহিমায়।
না জানি কতই তুমি—সুন্দর—মহান্।
রবি-শশী-গ্রহ-তারা, ভূধর-সাগর,
নদ নদী-প্রস্রবণ, পশুপক্ষীচয়,
সুনীল গগনতল—বিশ্বচরাচর,—
তোমারই মহিমার দেয় পরিচয়।
অনন্ত তোমার সৃষ্টি, হে অনন্তদেব!
ক্ষুদ্র এ হৃদয়ে মোর হয় না ধারণা।
অনন্তের মাঝখানে এককণা আমি ;
বিস্মিত বিমুগ্ধ হেরে জগত্-রচনা।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাশূন্য।

কোথা ফুটে চন্দ্র-সূর্য্য-তারা ?
অনন্তের কোন্ মহাদেশে ?
কোথা হ'তে আসে দিবসরজনী,
কোথা বা চলিয়া যায় শেষে ?

জগতের এত কোলাহল,
জীবনের হাসি-অশ্রুচয়,
কোন্ মহাসমাধিমাঝারে
চিরতরে সমাহিত হয় ?
চিন্তা করি কত মনে মনে
কিছু—কিছু বুঝা নাহি যায় !
যত ভাবি, ততই কি এক
অন্ধকারে ঘেরে এ হৃদয়।
কোথা ক্ষুদ্র ধরার মানুষ,
কোথা সেই মহাশূন্য দেশ ?
কোন্ দেশে কেবা আছে পড়ে,
কেমনে কে করিবে নির্দ্দেশ ?
মনে পড়ে স্বপনের মত
কত কথা, কত দুঃখসুখ ;—
কি ছিল, কি নাই যেন, কবে
দেখিছি কাহার যেন মুখ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

আশ্বাস-বাণী।

(মালঞ্চের প্রতি)।

মুছে ফেল' আঁখিধার,
বাঁধ গো হৃদয়-তার,
আবার নূতন সুরে গাহিতে হইবে গান।
বিষাদ-বেদনা ভু'লে
লও বীণা কোলে তু'লে ;
ছুটুক উৎসাহ-ধারা ভাসায়ে অবশ প্রাণ।
কভু কাছে, কভু দূরে
বর্ষ-ধ'রে ঘুরে ঘুরে
চরণ অবশ ব'লে চলিতে চাহনা আর ?
অবসাদ দূরে ফেলি
নবকুসুমের ডালি
লয়ে পুনঃ ভ্রম, সবে দিয়ে প্রীতি-উপহার।
তারই কার্য্য বীরোচিত,—
শতবার পরাজিত
হয়ে যে অটল থাকে শেষ-জয়-আশা ক'রে ;

পড়ে শতবার—কাঁদে,
তখনই হৃদয় বাঁধে,
মুছে নয়নের জল নূতন-উৎসাহ-ভরে।
তাই মুছ' আঁখি-জল,
হৃদয়ে ধরগো বল,
হরষে নূতন সুরে ধর ধর নবগান ;
বিষাদ-বেদনা ভু'লে
লও বীণা কোলে তু'লে ;
ছুটুক উৎসাহ-ধারা ভাসায়ে অবশ প্রাণ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

লাট-গৃহিণীর নূতন গ্রন্থ।*

সুখভোগের পর সুখের স্মৃতিসম্ভোগ। ডফারিণ-দম্পতি এখন ভারত-সাম্রাজ্য-শাসন-সুখের স্মৃতিসম্ভোগ করিতেছেন। বিষয়-বৈভব বিস্তর আছে, সম্ভ্রম-সম্মানও বিস্তর ; কিন্তু এখন সে 'অযোধ্যা নাই, অযোধ্যায় সে রামও নাই'—আছে তাহার স্মৃতি। ভারত-সাম্রাজ্যের সর্ব্বে-সর্ব্বা শাসয়িতা !!—এ পদ এবং সম্পদ সাময়িকমাত্র হইলেও বড় সাধারণ নহে। বহুবিত্তশালীরও ইহা শ্লাঘনীয়। বলা বাহুল্য, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেকের ন্যায়, ডফারিণদিগের জীবনের এ অধ্যায় উচ্চাদপি উচ্চ। জীবনে তাঁহারা যত সুখই ভোগ করুন না, (অবশ্য অনেক সুখই ভোগ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এখনও করিতেছেন ও পরেও করিবেন বটে ; তা, সুখ-সম্পদ-সম্ভ্রম যতই তাঁহাদের থাকুক না) সে সমস্তের সমষ্টি শতবার গ্রহণ করিলেও, প্রায় পূর্ণ ভারত-শাসন-সুখের সমতুল্য হয় না। প্রভুত্বের পরাকাষ্ঠা ! পরাক্রমের পূর্ণ অভিনয়। ভয়ে 'যত নৃপতি দ্বারস্থ'। কতক বা উদরস্থ। অবস্থা এই। আধিপত্য অখণ্ড। জীবনে পূর্ব্বে যাহা ঘটে নাই, পরে যাহা ঘটিবে না, মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহা ঘটিয়াছিল ; কিন্তু এখন তাহা নাই। তাহার স্মৃতি আছে। ডফারিণ-পরিবার সেই

* "Our Viceregal Life in India."

স্মৃতি সম্ভোগ করিতেছেন। স্বভাবতঃ করিবারই কথা। সংসারে সম্ভোগ-প্রণালী স্বভাবভেদে শত-সহস্র প্রকারের। কেহ স্মৃতি সুজীর্ণ করেন, কেহ মন্থন করেন, কেহ বা রোমন্থন করেন। সুখের স্মৃতি-রোমন্থনে সুখ আছে; মন্থন করিয়া সারগ্রহণে আরও সুখ। সে সুখ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, সার-বানের ভাগ্যেই ঘটে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব 'ভাইস্রয়'-পত্নী তাঁহার ভারতীয় স্মৃতির রোমন্থন করিতেছেন। রোমন্থন-কালে সুখাবেগে উদ্গার উঠিয়া সেই 'বাইশ্রিগ্রাল জীবনের' ভারতীয় স্মৃতি কিয়দংশ বাহিরে পতিত হইয়াছে; তাহা হইতেই ঠাকুরাণীর এই উপস্থিত পুস্তক উদ্ভূত।

লর্ড ডফারিণ দেশে গিয়াও "ডিপ্লোমেসি" লইয়া ব্যস্ত। তবুও ভারতের কথা ভুলেন নাই; আমাদের ভাগ্য বটে। ভোজ উপস্থিত হইলেই ভারতের ভাগ্য-কষ্টি আলোচনা করেন, ভূতপূর্ব্ব আত্ম-কীর্ত্তি-কলাপের পরিচয় দেন। নিমন্ত্রণের দিনে পানভোজনান্তেই ভারতামৃত রস অধিকতর উদ্বেলিত হয়,—নিমন্ত্রণ নহিলে সেটা নিয়ত হইতে পায় না, কারণ "মি-লর্ড" নিমেষমাত্রও নিশ্চিন্ত নহেন, নিয়তই 'নানান কার্য্যে' নিযুক্ত। কিন্তু তাঁহার ঘরণী অত্যন্ত উপযুক্তা। সহধর্ম্মিণী হইতে এতাদৃশ সহায়তা লর্ড ডফারিণের ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী আর কোনও প্রতিনিধি আর কখনও প্রাপ্ত হয়েন নাই। বিবি ডফারীণ বুদ্ধিমতী; কাযেই বুঝিয়াছিলেন যে 'বাইশ্রয়'-গৃহিণী ন্যায়ধর্ম্মতঃ "বাইশ্রয়নী"। আমরাও হিন্দুমতে ঐ কথা বলি; যেমন শিবের ঘরণী শিবানী, ইন্দ্রের ইন্দ্রানী। কিন্তু ইংরেজের আইনটা, বড়ই আক্ষেপ যে, অস্পষ্ট। ভর্ত্তার আপিসের কার্য্যের সহিত ভার্য্যার কতটা সম্বন্ধ কোনও কানুনেই খুলিয়া লেখে নাই। বিগত বড়-লাট নিজেও তাঁহার ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ের একটা ব্যবহারিক বিধি করিয়া যান নাই। তা না যা'ন, তজ্জন্য তাঁহার গৃহ-লক্ষ্মীর কার্য্যে কিছুমাত্র বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। লক্ষ্মী তাঁহার লর্ডকে শাসনকার্য্যে সমানে সহায়তা করিয়াছেন। নায়েবনীর হাঁসপাতাল "হবি"-নায়েবের নায়েবতী-আপিসের কতটা জায়গা জুড়িয়া ছিল, নায়েব নিজেই বলুন। ব্রহ্ম-বিজয় হইতে 'বাবু-বিদ্বেষ,'—সর্ব্বত্র সমান সাহচর্য্য ভার্য্যা ভর্ত্তাকে করিয়াছিলেন। প্রমান,—প্রথমোক্তের ন্যায় শেষোক্ত সমীচীন বিষয়ও লাট-গৃহিণীর গবেষণায় গ্রন্থিত আছে।

এখন গ্রন্থের বিষয়। গ্রন্থের নামটা অতি চমৎকার, ততোধিক রুচিকর। "Our Viceregal Life in India." তা বটে ত !!!

ব্যাস-বাল্মীকি-কপিল-কনাদের দেশে আসিয়া, সে দেশে সম্রাজ্ঞী সম্ভ্রমে দীর্ঘকাল প্রবাস করিয়া, একাধারে সমগ্র পৃথিবীর, জড়-ও-জীব-প্রকৃতির 'সার-সংগ্রহ' সন্দর্শন করিয়া, ভারতক্ষেত্র হইতে লেডি ডফারিণ স্মৃতি সাজাইয়া লইয়া গিয়াছেন; কিসের ?—মুরগীর, মশালচীর, আণ্ডা-ঘরের, আস্তাপোলের, এবং আত্ম-গৌরবের,—ছোট-হাজরির এবং তজ্জাতীয় বহুতর বৃহৎ পদার্থের। স্মৃতির এবং সাহিত্যের এ সব অতি উপযুক্ত সামগ্রীই বটে, প্রশস্ত-হৃদয়তা রও পূর্ণ পরিচয়।

পুস্তকের যে যে অংশ আমরা দেখিলাম, তাহাতে ঠাকুরাণীটার কেবল আত্ম-আধিক্যতার কথা; এবং এদেশীয় লোকদিগের প্রতি কুঞ্চিত কটাক্ষ। "আমার গাড়ি, আমার ঘোড়া, আমার পদ, আমার পিয়াদা, আমার পোষাক, কত কর্ণেলে আমার রান্নাঘর চৌকি দেয়, কত ক্যাপ্তেন কোতোয়ালী করে, লর্ডে 'কুটি যোগায়', রাজা-রাজড়ায় রোসনী দেখায়।" ইত্যাদি ও এতদনুরূপ আপন-আধিক্যতা করিয়া লাট-গৃহিণী গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

প্রবীণার মেয়ে-পাঁচা পাঠক একটু উপভোগ করুন। লাট-গৃহিণী লিখিতেছেন ;—

"রাজকীয় রোজ"। (১)

"আমি এখন তোমায় বোল্‌বো, কেমনতর করে আর কি কি করে আমার দিন কাটে। ডি—* খুব সকাল-সকাল উঠে কায কত্তে লেগে যান। আমি কিন্তু উঠি আটটার সময়। সাধারণতঃ ঐ সময়েই সেজে গুজে তৈয়ার হই। ন'টার সময় প্রাতরাশে বসি; আমার খাস-বৈঠকখানার বাহিরের বারান্দায় বসে প্রভাতী-ভোজ খাই। খেতে বসি—আমরা চারিটীতে। ডিঃ—অতি অল্পক্ষণ থাকেন; একটু বা পাঁও চারী করে বেড়ান। বারান্দার ধারের উপর থেকে সবুজ সব পায়রা আমাদের 'পানে' তাকাতে থাকে। দশটার সময় লর্ড ব্রেসফোর্ড এসে রাজ্যেশ্বরের সাক্ষাৎ-কার লাভ করেন। তার পর তিনি (ব্রেস্‌ফোর্ড) আমার কাছে আসেন। তাঁকে যা যা আমার 'ফরমাস' কত্তে হবে, জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হবে, আমি সে সব লিখে রাখি। আমার "লিষ্ট" রকমারী ও নানা রঙের, তা' মজারও খুব। লর্ড ব্রেসফোর্ড একে একে সমাধা করেন।

(১) Viceregal day.

* স্বামী লর্ড ডফারিণ।

"আমাদের বাড়ীতে ফিএতিকত্তের এক এক বিভাগ লিম্মা। মেজর কুপার হচ্ছেন গিয়ে "ভাণ্ডারী"। তাঁতে আর আমাতে গৃহস্থালীর সব খুঁটী-নাটী তদারক করি। খুটী-নাটীর উপর দুজনে মিলে খুব কচ্‌কচি করি, কাগড় করি। রান্নাঘর ও রাঁদুনীদের মুৎসুদ্দী—কাপ্তেন হারবর্ড। কাপ্তেন খানাখোর হচ্ছেন গিয়ে—গান-বাজনার দারোগা। বাজনা ও বাজনারের বন্দোবস্ত তিনি করেন। আমি তাঁকে ঘণ্টে দিয়েছি যে, রাত্রি আটটা থেকে ন'টা পর্য্যন্ত, যতক্ষণ আমরা "বড়-হাজরি" খাই, ততক্ষণ অবধি যেন 'ব্যাণ্ড' বাজ্‌তে থাকে। নিমন্ত্রণ দিবার ভার কাপ্তেন বারণের উপর। আস্তাপোল লিম্মা লর্ড উইলিয়মের। আর সব A—D—Cরা (আরদালীরা) তাঁর অধীনে। তারা সব বিষয়ের ব্যাওরা তাঁর কাছে হাজির করে। সাম্রাজ্যের উচ্চতম সৈনিক ব্যাপার হইতে, আমার খিড়কী-দ্বারের খিলটী পর্য্যন্ত, রাজ্যেশ্বরের মশারীর মধ্যের মশাটীও পর্য্যন্ত এই গুণবন্ত লর্ড উলিয়ম ব্রেস-ফোর্ডের কার্য্যভুক্ত। এই সব কার্য্যই তিনি সমানরূপে ও সুচারুরূপে সমাধা করেন। যত-কিছু হুকুম-হাকাম সব তিনি তাঁর খাতায়, কোনদিন বা কামিজের আস্তিনের উপর টুকে রাখেন এবং যতক্ষণ অবধি আমার আদেশ সকল "হরেঘুঁটে" তামিল না হয়, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হন না। আস্তা-পোলে তাঁর অতি চমৎকার চূড়ান্ত বন্দোবস্ত।" ইত্যাদি।

ইহা "মেয়ে-পাঁচা" বটে; কিন্তু খুব মিষ্ট মনোজ্ঞ,—খুব কৌতুকপ্রদ।

এক শ্রেণীর ইংরাজদের মধ্যে "নেটিব"দের ইংরেজী-রচনা একটা বাঁধী রসিকতার বিষয়। উচ্চপদস্থ গ্রন্থকর্ত্তা তাঁর গ্রন্থমধ্যে সে রসিকতারও রগড় ভুলিয়া যথারীতি রঙ্গ-ব্যঙ্গ করিতে ভুলেন নাই। ১৮৮৫ শাল, ৭ ই জানুয়ারি, বুধবারের রোজ-নামচায় "নেটিব"লোকের ইংরেজি-রচনার নমুনা দিয়াছেন। অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই।

সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা,—ঠাকুরাণী দীর্ঘজীবিনী হইয়া সুখের স্মৃতি সম্ভোগ করুন। আমরাও সে স্মৃতির "সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" এই খানে শেষ করি।

একটী ফুলের কথা।

কোন মালঞ্চের এক কোণে কতকগুলা আগাছার আড়ালে একদিন একটী ফুল ফুটিয়াছিল। ফুলটী যে দিন ফুটিল, যে দিন ছোট কুঁড়িটী ফুটিয়া একটী ছোট ফুলের আকারে মালঞ্চের সেই পাশটুকু আলো করিয়াছিল, সেই দিন ক্ষুদ্র ফুলের ক্ষুদ্র আশাটুকু আপনার ক্ষুদ্রত্বের সীমামধ্যেই সঙ্কুচিত ছিল, তখন সেই জগৎটুকুর মধ্যে দুরাশার বহুবিস্তৃত আসনের স্থান ছিল না।

এক দিন গেল; মালিনী ফুলের সাজি হাতে করিয়া প্রভাতে মালঞ্চের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। একদিকে গোলাপ ফুটিয়াছে; গোলাপ রূপে সুন্দরী,—সৌরভে ভাণ্ডার পূর্ণ, তায় আবার যন্ত্রের ধন; সুতরাং মালিনীর প্রথম হাসিটুকু তাহারই ভাগ্যে পড়িল। মালিনী ফিরিয়া বেল, মল্লিকা, যুঁই, গন্ধরাজের দিকে দাঁড়াইল। এদের গরব না থাকিলেও একটু অভিমান ছিল; রূপের ছটা না থাকিলেও সৌরভের ঘটাটা বড় অধিক। কাযে কাযেই মালিনীর কাছে আপনাদের প্রাপ্য অংশ বুঝিয়া পড়িয়া লইল। যন্ত্রের ধনের আদর অধিক। মালিনীও তাহাদের বঞ্চিত করিল না।

আমাদের ক্ষুদ্র ফুলটী আড়ালে থাকিয়া সবই দেখিল। দেখিয়া তারও যেন মনে একটু সাধ হইল; ক্ষুদ্র মুখখানি যেন আরও প্রফুল্ল হইল। না হইবেই বা কেন? আদরে অনিচ্ছা কার? সোহাগেই বা বিরাগ কোথায়?

প্রতিমুহূর্ত্তে মালিনীর আগমন-প্রত্যাশায়, আপনার ক্ষুদ্র দেহখানি বাড়াইয়া দিতে লাগিল; আপনার ভাণ্ডার শূন্য করিয়া মালিনীর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বোধ হয়, মালিনীর চক্ষে গোলা-পের ললিত আভাটী বড় অধিক ফুটিয়াছিল; বেলার, যুঁইয়ের, মালতীর সৌরভ তাহার নাসিকার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাই ক্ষুদ্র ফুলের এ সামান্য আশাটুকুও ফলবতী হইল না। মালিনী সে দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইল। ফুলটী নিরাশ্বাস হইল না; কেবল আগাছা-বনের নিন্দা করিল। আশপাশের কাঁটাগাছগুলা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত অভিশপ্ত হইতে লাগিল।

তাহার আশা কমে নাই; বরং তার সাধের সংসারে গোলাপকে কল্পনায় আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া অভিমানে ফুলিতে লাগিল; বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজের প্রতি সরোষ কটাক্ষপাতে ত্রুটি করিল না। আপনার

মনে আপনি ফুলিয়া, আপনার ক্ষুদ্রত্বের সীমাতিক্রম করিয়া, আপনাকে সমস্ত জগৎময় দেখিতে লাগিল।

কোথায় বা গোলাপসুন্দরী? কোথায় বা তার রূপ? কোথায় বা তার সৌরভ? আর আর ফুল? ছি! ছি! তুলনাই হয় না!

ফুলটী কিন্তু আত্মগরিমার স্বর্গরাজ্য হইতেও মালিনীকে এক তিলের জন্য চক্ষের আড়াল করিতে পারে নাই। তাহার প্রত্যেক কার্য্য ফুলের চক্ষে সহস্রগুণ বর্দ্ধিত-আয়তনে প্রতিফলিত হইতেছিল।

মালিনী এতক্ষণ আপনার মালঞ্চের শোভা দেখিতেছিল; মনে মনে আপনার কৃতিত্বে প্রশংসা করিয়া পরিতুষ্ট হইতেছিল। কিন্তু বেলা বাড়িতে লাগিল, সূর্য্যের তাপটা কিছু প্রখর হওয়াতে মালিনীর যেন চৈতন্য হইল; তাড়াতাড়ি ফুল-তোলা আরম্ভ করিয়াছিল। যুঁই, বেল, মল্লিকা, মালতী একে একে সাজীতে স্থান করিয়া অধিকার করিতে লাগিল; দুই চারিটা শিউলী, বকুল, টগরও সেই সঙ্গে মিশিয়া গেল;—সর্ব্বশেষ গোলাপ! মালিনী সহসা শিহরিয়া মুখখানি একটু বিকট করিল। উহু-হু! হাতে গোলাপের কাঁটা বিঁধিয়াছে!

ক্ষুদ্র ফুলের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। বোধ হয় মালিনীর সাজীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইলেও সে এত আনন্দ উপভোগ করিত না। কিন্তু শেষ আনন্দের মধ্যেও তার নিরানন্দ আসিয়া জুটিল। মালিনী এতদূর লাঞ্ছিতা হইয়াও গোলাপকে ছাড়িল না; তুলিয়া সাজীতে সাজাইয়া রাখিল।

এইবার ক্ষুদ্র ফুলটীর আত্মগরিমায় বহুক্ষত ক্ষুদ্র হৃদয় ফাটিয়া গেল। কি? এত লাঞ্ছনার পর এত আদর! এত নিগ্রহভোগের পর এত সোহাগ! ফুলের প্রাণে সহিবে কেন? বিশ্বসংসারব্যাপিনী কল্পনাগঠিত সাধের স্বপ্ন আপনিই ভাঙ্গিয়া গেল!

হায়! এতক্ষণের পর সে দেখিতে পাইল, সেই কাঁটা-বনের মধ্যে তার মত অনেকগুলি ফুল গড়াগড়ি যাইতেছে; সকলেই শুষ্ক, সবগুলিই বিবর্ণ। যেন পরশ্রী-কাতরতায় তাদের স্বভাব-শোভা একদিনেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ঈর্ষা ও অভিমানে যেন তাহাদের ক্ষুদ্র দেহের অতি সামান্য রসটুকু শুষিয়া লইয়াছে। কি আছে? কেবল শুষ্ক বিবর্ণ কায়ার ছায়া মাত্র!

শ্রীসাঃ।

টাউন-হল-তামাসা—লণ্ডভণ্ডের পালা।

(গড়ের মাঠে কুড়াইয়া পাওয়া।)

"ধুয়ো।"

ভণ্ড কোল্লে বাঁড়ুয্যের পো চেপে ধর্ রে দামা;
রাজ-ভক্তি ভেস্তে গেল সুরেন্দ্রকে থামা।
মাঝ-গাঙেতে ডোবে তরী, সামাল্ সামাল্!
বাঁড়ুয্যে বেল্লিক ব্যাটা ড্যামেজ কোল্লে মাল!

পয়ার।

"শুনেছ, ও শম্ভু-গুড়ো, খবর সেদিন্‌কার?
টাউন্-হলে মদ্দগুলোর প্রাদ্ধের ব্যাপার?
পদীর ব্যাটা পদ্ম-লোচন কোরে এলো জারি,—
(যত) সুয্যি-চন্দর চুণ্‌সে গ্যালো, আহা সারি সারি!
বড় বড় গুড়ের হাঁড়া ভেঙে হোলো চুর!
তাজা তাজা রাজা, কত রায় বাহাদুর!
মুক্ত, মোহর, জমিদারী, জায়দাদ্, জিরাত,
জাহান্নমে গ্যালো—মান, আসবাব, খেলাত!
যোতীন্দরের জ্যোতিহীন, প্যারী মোনবতী,
পণে-রাম প্রভা-হীন, দুর্গার দুর্গতি!
সে দিনকার সুরে ছোঁড়া বাজি কোল্লে মাৎ;
বড় বড় বীরন্দর আহা কুপো-কাৎ!
টাকার তোড়া, ঘোড়া, ফোড়া,—পড়ে রৈল সব।
কেষ্ট-বিষ্টু-কুম্ভকর্ণ লজ্জায় নীরব!
গতিকে গোঁসাই-চাচা গোসায় গরগর;
কোঁৎ পাড়্‌লেন কুঞ্জ-কাকা, কোপে কম্পজ্বর!
মেতার কোমোর ধ'রে মাথু উঠে গায়;
ফেলে তবু না পায় পানী গভীর দরিয়ায়।
হারিসন বৃদ্ধিমান চেপে গেলেন সব;
কর্ত্তার কটাক্ষে কটন কাজেই নীরব।
সরকার সট্‌কান দিলা, (স্বাধীন কি না অতি)!
কারে পড়ে' কুরুক্ষেত্রে সুরেন হলো রথী।
'ছেলে ছোক্‌রা যত্তা • • ঢ্‌কুলো পালে পালে,'
বাছুরের পাল যথা বাঘের গোয়ালে।
বাছুর-ভয়ে বাঘ পালাল;—এ কি ভেল্কিবাজী!

আর কিছু নয় সেটা, খুড়ো, বাঁড়ুয্যের কারসাজী।
অর-ঘুরে সুরে-ছোঁড়ার আস্পর্দ্ধা এমন,
মুখ-সাম্‌লে কয় না কথা, শোনে না বারণ!
তাই-না ভারত একেবারে যাচ্ছে ছারেখারে,
বাঙালীর মুখ হাস্‌ছে গঙ্গার দু-ধারে!
তাই-না ভাদ্রমাসে শীত, বর্ষা পৌষমাসে;
তাই-না মেলেরিয়া-জ্বর, ধান হয় না চাষে!
যজ্ঞ কোল্লে লণ্ডভণ্ড, পাবণ্ড দুর্ম্মতি।
বিশবৎসর পিছিয়ে পোড়্‌লো দেশের উন্নতি।
তাইতে এলেম তাড়াতড়ি, খুড়ো, তোমার কাছে;
"ডেক্সনারি" খোঁজো দেখি, উপায় কি কি আছে?'
ডেক্সনারি দেখে, মার চোখা-চোখা বাণ,
সপ্তরথী ঘিরে বধ সুরে-ছোঁড়ার প্রাণ
পিছে পিছে আমরা আছি, চিন্তে নাইকো তার;
সুযোগ বুঝে ধর্‌বো ধামা একটু ইসারায়।"

(ইতি বাসর-বর্ণনা)।

অনন্তর

আসর-বর্ণনা।

(এলো-মেলো ছন্দ।)

ভিক্টর আস্‌বেন,—ভক্তির রগড়—সভা টাউন্-হলে;
সেজেগুজে সভ্যগণ চল্লেন দলে দলে।
বড় বড় ভুঁড়ী বাঁধিল পাগড়ী,
চৌ-ঘুড়ী হাঁকিয়ে যায়,—
দড়বড়-গতি।
"পেট বড়, কি পাগড়ী বড়,
কহ, প্রজাপতি!"
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মারে কহে করি সম্বোধন,
"বিস্তারিয়ে কহ প্রভু, তাহার লক্ষণ।"
ব্রহ্মা কহে,—"তবে প্রিয়ে, কর অবধান।
পেট-ভরা বিদ্যে-সাধ্যি, পাগড়ী-ভরা মান;
কোনটীই খাট নয়, দু'টীই সমান।
উভয়েই তুল্য মূল্য বিক্রয়ে নিলাম।
একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, ডবল সেলাম।

তখন—
সারি সারি সারি, শাল-সাম্‌লাধারী
বসি গেলা সুখাসনে;
গোঁফে দিলা চাড়া, গোলাপী রগড়া,
এ-পাড়া ও-পাড়া
কাঁপে সঘনে।
'লাইট্, কল্‌চার,' মি-লর্ড, লিডার,
নামী নাইট-কম্যান্ডার,
মার্‌চ্যাণ্ট্, রাজা,— সদা-ঘুতে ভাজা,
অগাধ-ধন-ভাণ্ডার;
কেহ দেশপতি, কেহ দলপতি,
কেহ বা ভূপতি,
(পতি-ছাড়া কেহ ন'ন)।
বিদেশ-যোড়া নাম, উঠোন-যোড়া থাম,
তাঁত-কাটা প্রেটি্‌শিয়ন।
'প্রিবিয়ান দল, পরিত্যক্ত মল
পরশে-অশুচি কায়!
"তু"-বলে' ডাকিলে, আস্‌বে সবে মিলে,
"ডিটো" দিবে ফি-কথায়।
এই ত ব্যাভার, এই ত বিচার,
চিরকাল আছে রীতি।
ঐশ্বর্য্যের করে, চিরকাল-ধ'রে,
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি।
দুঃখী পেটে মরে, সুখীর পেট ভরে,—
এই ত পবিত্র প্রথা।
তুই আবার কে'টা, ভাড়ানীর বেটা,
এ কথায় ক'বি কথা?
হবে রিসেপ্‌শন্,— লক্ষ লক্ষ পণ,
রঙ্-তামাসা মনোরথ।
তামাসাই ভক্তি, তামাসাই মুক্তি,
তামাসা স্বর্গের পথ!
অতএব
বাজুক বাজনা, দাও কসে খানা,
নাচুক রঙ্গিনী রসের ভরে।
আতসে আস্‌মান করো খান খান,
উজ্জ্বলো আলোকে সকল ঘরে।

দেখুন ভিক্টর, চোখের উপর
সুখের ফোয়ারা ছুটিছে দেশে।
আলোকে পুলোক, রাজ্যশুদ্ধ লোক,
সদানন্দে শাফ্ চলেছে ভেসে।
শ্রীরাম-অবতার সব জমিদার,
করে না জুলুম কাহারো প্রতি,
উদার, বদান্য, দান করে অন্ন,
স্বদেশের হিতে একান্ত ব্রতী।
আহা!
হবে রং-তামাসা কত,
আস্‌মানেতে আতসবাজি
পুড়বে শত শত।
বাজবে গদ্, উড়বে মদ,
নাচবে বিবিজান;
গোলাপের ছড়া, আতরের ঘড়া
তর্ করে দিবে প্রাণ।
সাজবে শং, বাজবে রং,
চোড়বে থাকে থাঁকে।
ভাসিয়ে ক্ষিতি, ভগবতী
উড়বে ঝাঁকে ঝাঁকে!
বৃষ বাহুড় মৃগ শূকর
পোড়বে বলিদান;
নইলে পরে কেমন করে'
রইবে রাজার মান?
কোর্‌বে রোসনি গুলজার;
তাহে দেখ্‌বেন কুমার
মোদের ভক্তির বাহার।
দেশে রইবে না আঁধার!—
এত জ্বাল্‌বো চেরাগ্-বাতি।
তোড়া-তোড়া লাদ্‌বে টাকা
বড় বড় হাতি।
(যত) কাঙাল-কুঠে খাবে জুঠে
এত টাকার কাঁড়ি!
ছিছি, না না, তা হবে না;
ভাঙ্‌বো হাটে হাঁড়ি।'
এতেক মন্ত্রণা যবে কৈল আঁটা-আঁটি,

মর্ম্মান্তিক জোরে সুরে ঢোলে মাল্লে কাটি।
সভামাঝে উঠ্‌লো তখন ঝাঁকে ঝাঁকে হাত;—
অকাটা নিশান, বাঁড়ুয্যের বজ্রাঘাত।
হেঁট-মুণ্ড ছিন্ন-শুণ্ড বীরভদ্রগণ।
কালা ত কদম্ব ডালে কলঙ্ক এখন।
বলে—
'আমরা প্রবীন, ছোঁড়া রসহীন,
বুঝে না সুরস কেলি;
এত ভাবভরা পিরীত-পসরা
এখন কোথায় ফেলি?'
ভোঁতারাম রায় বলে,—'ভাই ভম্বলদাস,
এতকাল পরে আজ হলো সর্ব্বনাশ?'
রাজা কহে, "ওহে রাজু, কি হবে উপায়?"
রাজু কহে, 'মহারাজ, ভাবনা কি তায়?
ঘরে গিয়ে কোর্‌বো সভা, ভাড়া কোর্‌বো ভোট;
বাজি-বাজ্‌না আস্‌বে যখন, দেখ্‌বে তখন চোট।
বোমের জোরে বাঁড়ুয্যেরে কোর্‌বো গো বধির,
বাই-নাচ দেখে বেটার চক্ষু হবে স্থির!
ইস্কুল-কলেজগুলো কোর্‌বো কারাগার,
বাঁড়ুয্যে ব্যাকুল হ'য়ে হবে গঙ্গাপার!
পেটি ঘটে পিশে পরে কোর্‌বো পরেশান।
চলুন, এখন পলাই ঘরে কুড়িয়ে লয়ে মান'!"
টাউন-হলী পালা সায়, পাগ্‌লা কানাই ভণে;
সে তামাসার তুল্য কিবা আছে ত্রিভুবনে?
হয় নি নিজামপুরে, নহে ত্রিবাঙ্কুরে,
তুমুল তামাসা যেমন বাঙ্গালীর সহরে।
রাজা যদি রসিক হন, কোর্‌বেন উপভোগ
কর্ণভরে, কোল্‌কেতার কুরুক্ষেত্র যোগ!

প্রেমোন্মত্ততা।

তোমাকে ভালবাসি—তুমি হাসিলে হাসি, কাঁদিলে কাঁদি। কেন তোমাকে ভালবাসি? তুমি ভাল, কি মন্দ? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না; কেবল এই মাত্র জানি যে, তোমাকে ভালবাসি; ভালবাসিয়াই আমি সুখী, ভালবাসাই আমার কাজ। প্রতিদানে তুমি আমাকে ভালবাস কি না, তাহা জানি না;—জানিতে চাহিও না। আমাকে ভালবাসিয়া যদি তুমি সুখী হও, তবে ভালবাস; আর যদি সুখী না হও, তবে ভালবাসিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি যাহাতে সুখে থাক, তাহাতেই আমার সুখ; তুমি যাহাতে অসুখী হও, তাহাতেই আমার অসুখ। এ সংসারে আমার বলিতে যাহা-কিছু, তৎসমস্তই তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি। তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছি। আমার ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, কর্ত্তব্য নাই, অকর্ত্তব্য নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই; এক মাত্র কার্য—তোমাকে ভালবাসা, তোমাকে সুখী দেখা। তোমার জন্য করিতে না পারি এমন কায নাই। দুরারোহ গিরি লঙ্ঘন করিতে পারি, অকূল সমুদ্র সন্তরণে পার হইতে পারি, যাহা করিতে মানুষ ভয় পায়, ঘৃণিত বলিয়া লোকে যাহার ছায়াও পদদলিত করে না, আমি তাহাও অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারি। আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, মন, আত্মা সকলে মিলিয়া এক কেন্দ্রাভিমুখে প্রধাবিত;—সে কেন্দ্র তুমি। তোমার জন্যই আমার শরীরধারণ—আমার স্বতন্ত্র কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, আমার স্বতন্ত্র জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই। লজ্জা ভয়, মান অভিমান, ধর্ম্ম তীর্থ—সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছি; সমস্ত বিনষ্ট করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। তুমি আমার বড় যত্নের ধন, আমার অনেক সাধনের সামগ্রী, আমার প্রাণের প্রাণ। কি বলিলে তোমার সহিত সম্বন্ধটা প্রকাশ পায়, তাহা বলিতে জানি না—বলিবার ক্ষমতা বোধ হয় মানুষের নাই,—কোন ভাষাতেই বোধ হয় তাহা প্রকাশ করিবার যোগ্য কথা নাই। আমার ধ্যান জ্ঞান, জপ তপ, সুখ স্বস্তি—সমস্তই তুমি; জাগ্রতে স্বপনে, শয়নে ভ্রমণে, মনে নয়নে কেবল তুমি বিরাজ করিতেছ। তুমি-ছাড়া আমার অস্তিত্ব নাই, আকাশপাতাল শূন্যময়, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা অন্ধকারময়। তুমি আমার কে, তাহা আমি জানি না। তবু যদি তুমি আমার কে হও, তাহা বলিতে হয়, তাহা হইলে বলি—তুমি আমার ঈশ্বর।

ঈশ্বর কি, তাহা জানি না; আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরকে কি প্রকারে এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিব? কিন্তু ঈশ্বরের যে প্রকার সংজ্ঞা বা বর্ণনা শুনি ও অনুভব করি, তাহাতে তোমাকে ঈশ্বর বলিতে কাতর নহি;—যদি স্বয়ং ঈশ্বর না হও, তুমি যে আমাকে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যাইতে পার, যে পথে গেলে ঈশ্বর-সাক্ষাৎ লাভ হয়, তাহা যে তুমি বলিয়া দিতে পার, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রেরিত।

আমরা উপরে যে অস্পষ্ট ছবিখানির রেখাগুলি অঙ্কিত করিলাম, সেখানি যে প্রেমের ছবি, তাহা কি আর বলিতে হইবে? প্রেম পবিত্র, প্রেম স্বর্গের সামগ্রী। পৃথিবীতে কদাচ কেহ কখন তাহার ছায়ামাত্র স্পর্শ করিয়াই ধন্য ও জগৎপূজ্য হইতে পারেন। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি কয়েক জন মাত্র ইহার তাৎপর্য্যগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা দেবতা বা ঈশ্বরের অবতার। যে পরকে আপন করিতে পারে, আপনার অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া পরে মিশিতে পারে, পরের দুঃখ আপনার হৃদয়ে পুরিয়া পরের জন্য কাঁদিতে পারে,—সেই প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝে; তাহাকে দেবতা ভিন্ন আর কি বলিব? এ সংসারের কেমন দোষ, এ জড়জগতের ক্ষিতাপ্তেজঃমরুদ্ব্যোমের কেমন জড়স্বভাব যে, লোকে কেবল আপনাকেই চিনে, আপনাকেই কেন্দ্র করিয়া সংসারে বিচরণ করে; ভুলিয়াও পরের দিকে কেহ চায় না, কেহ চাহিতে জানে না এবং শিখে না। আপনার স্বার্থ লইয়াই লোকে পাগল, আপনার দুঃখেই লোকে বিভোর, তাই সহজে কেহ পরের দুঃখ আপনার হৃদয়ে পুরিয়া ভারী ভারী করিতে চাহে না। যাহারা সেই মোহিনী স্বার্থকে পরের জন্য বলি দিতে পারে, যাহারা আপনার দুঃখ চাপিয়া পরের দুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর, তাহারা পৃথিবীর লোক নহে,—তাহারা দেবতা, তাহারা নমস্য, তাহারা পূজ্য। পরের দুঃখ আপনার হৃদয়ে করা কি সহজ কাজ? কয় জন পরের জন্য কাঁদিতে জানে? কয় জন আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া পরের অশ্রুমোচন করিতে পারে? মানুষের এমনই স্বভাব যে, আমি সুখে থাকিলেই হইল—তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হউক না কেন। যে জননীর সমান প্রেমময়ী স্নেহময়ী সাক্ষাৎ-স্বর্গরূপিণী পৃথিবীতে আর নাই, কোন কোন স্থলে তাঁহাকেও স্বার্থের জন্য সন্তানের অনিষ্ট করিতে শুনা গিয়াছে—অন্যের কথা আর কি বলিব? প্রাণের সমান আর কিছু

নাই, কিছুতেই লোকে প্রাণ দিতে পারে না ;—প্রেমিক ভিন্ন প্রাণদানের মাহাত্ম্য অন্যে কেহ বুঝে না। খ্রীষ্ট পরের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ঈশ্বরের পুত্র, প্রেমরাজ্যে অদ্বিতীয় পুরুষ। প্রেম কি প্রাণকে মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে? প্রেমের নিকট সাগর গোষ্পদ, গিরি রেণুপ্রমাণ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হস্তামলকবৎ প্রতীয়মান হয়। প্রেমিক বজ্রকে দৃক্‌পাত করে না, উত্তাল-তরঙ্গ-বিলোড়িত সাগরকে তুচ্ছ করে, অবলীলাক্রমে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করিতে পারে। প্রেমিকের অসাধ্য কিছুই নাই। সে চন্দ্রসূর্য্যকে উপাড়িয়া পাড়িতে পারে, নক্ষত্র চর্ব্বণ করিতে পারে, ফুৎকারে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতি নির্ব্বাপিত করিতে পারে, লক্ষ লক্ষ মত্ত হস্তী উপাসিয়া গিলিতে পারে। এত ক্ষমতা, এত দৃঢ়তা, এত সহিষ্ণুতা নহিলে কি প্রেমলাভ হয়? এমন না হইলে কি ঈশ্বর মিলে?

শিহলণমিশ্র—"বিল্বমঙ্গল" নামে আজকাল পরিচিত। তাঁহার ভক্তির পরাকাষ্ঠা ও প্রেমের অদ্ভুত চিত্র "ভক্তমাল"-গ্রন্থে সংক্ষেপে চিত্রিত আছে। তিনি প্রেমে পাগল, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, কর্ম্মকাণ্ড-বিবর্জ্জিত, প্রেমের জন্য সর্ব্বত্যাগী, একজন পরম প্রেমিক সন্ন্যাসী। তিনি যে-সে প্রেমিক নহেন, তাঁহার আদর্শের প্রেমিক সহজে মিলে না। যে প্রেমে মত্ত হইয়া মহাযোগী আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া, ষড়ঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া একাগ্রচিত্তে মহাধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এ সেই প্রেম। যে প্রেমে মত্ত হইয়া ভাগ্যা স্বামীসেবা করেন, স্বামী-পাদোদক পান করেন; স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান সার করিয়া আপন অস্তিত্ব স্বামীতে মিশাইয়া দেন, স্বামী-বিরহে অনন্ত চিতার আরোহণ করিয়া দুই অঙ্গের পরমাণু একত্র করেন;—এ সেই প্রেম। যে প্রেমে মত্ত হইয়া জননী অসহ্য গর্ভ-যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করেন, অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া জগতের বিপুল জ্বালা-যন্ত্রণা মস্তকে পাতিয়া সন্তানকে লালনপালন করেন, সন্তান হাসিলে হাসেন, কাঁদিলে কাতর হন, সন্তানের অসুখ হইলে দেবতার দ্বারে বুক চিরিয়া রক্ত দেন, বিল্বমঙ্গলের প্রেম—সেই প্রেম। বিশ্বরাজ্যে যেমন বায়ুর আকৃতি একই প্রকার, অথচ যখন যে আধারে থাকে, তখন তদনুরূপ আকার ধারণ করে, তেমনই প্রেমেরও আকৃতি-প্রকৃতি এক,—কেবল পাত্রভেদে রূপভেদমাত্র।

বিল্বমঙ্গল বারাণসীর একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও চিন্তামণি নাম্নী একজন বারাঙ্গনার প্রেমে মুগ্ধ। চিন্তামণির প্রেমে তিনি এমনই

বিভোর যে, তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না—চিন্তামণি-ছাড়া তাঁহার যে পৃথক অস্তিত্ব আছে, তাহাও অনুভব করিতে পারেন না। তাই তাঁহার লজ্জা নাই, ভয় নাই, লোকনিন্দার প্রতি দৃষ্টি নাই, মান-অপমান জ্ঞান নাই—সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া একটা বেশ্যার পায়ে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বসিলেন। পিতৃবিয়োগে হইলে বিল্বমঙ্গল সমস্ত বিষয়বিভবের অধিকারী হইলেন; কিন্তু তাহা তুলার মত কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার স্থিরতা নাই। চিন্তামণির বড় বড় লোহার সিন্দুক অল্প দিনেই ধনে পূর্ণ হইয়া উঠিল। চিন্তামণিকে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না;—পরশুরামের ন্যায় মাতৃহত্যা করিতে আজ্ঞা পাইলে বিল্বমঙ্গল তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। যাহার জন্য বিল্বমঙ্গলের এত প্রগাঢ় প্রেম, এত গভীর ভালবাসা, সে কি দেখিতে পরমা সুন্দরী? সে কি কোন বিশেষ গুণে গুণবতী? তাহার কিছুই নহে—তাহার রূপও নাই, গুণও নাই। তথাপি বিল্বমঙ্গল তাহার প্রণয়মন্ত্রে মুগ্ধ। চিন্তামণির কোন আকর্ষণ নাই, তথাপি বিল্বমঙ্গল তাহাকে ভিন্ন সংসারে আর কিছুই জানেন না, আপনাকেও চিনেন না। প্রবল প্রেমতরঙ্গের নিকট জাতি, কুল, মান, মর্য্যাদা—কিছুই দাঁড়াইতে পারে না; রূপ, গুণ, যৌবন সে তরঙ্গে কোথায় ভাসিয়া যায়! নিঃস্বার্থ প্রণয় কিছুই চাহে না; তাহার পক্ষে কোন প্রলোভন নাই, কোন বাধাবিঘ্ন নাই। প্রেমময়ী জননী সুরূপ কুরূপ, নির্গুণ গুণবান—সকল সন্তানকেই সমভাবে স্নেহ করেন, তাঁহার চক্ষে অন্ধসন্তান পদ্মলোচনবৎ; যে সকলের অনাদরের পাত্র, জননীর নিকট সে সন্তানও অতীব স্নেহের পাত্র।

প্রণয়ী সংসারে আর কিছুই চাহে না। চাহে—কেবল সেই প্রণয়পাত্রকে; চাহে—কেবল তাহার সঙ্গে মিলিয়া এক হইতে; চাহে—কেবল 'অহং সঃ' হইতে। তাহা না করিতে পারিলে প্রণয় মিলে না। যে ব্যক্তি

"পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে;
পরকে আপন করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে।"

চিন্তামণি বার-বণিতা মাত্র; সে এ কথার অর্থ বুঝে না, তাই গত রজনীতে বিল্বমঙ্গলের গমনে বিলম্ব দেখিয়া বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভোজন করিতে বসিয়াছিল। বিল্বমঙ্গল আসিলে নিদ্রার ঘোরে ভাল করিয়া তাঁহার সহিত

আলাপ করে নাই। বিল্বমঙ্গল তাহাতে একটু ব্যথিত হইয়া একটু বাহ্যিক বিবক্তির লক্ষণ দেখাইয়া চিন্তামণির সহিত প্রেম-কলহ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু তাহা পারিবেন কেন? চিন্তামণির আগমন-লালসায় পথে বসিলেন, চিন্তামণির সাক্ষাৎ পাইলেন, কলহ ভঞ্জন হইল; আবার রঙ্গনীতে আসিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। বিদায় কি সহজে লইতে পারেন? নানা ছল করিয়া এক একটা অত্যাবশ্যক কথা যেমন স্মরণ হইতে লাগিল, অমনি এক একবার ফিরিয়া ফিরিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন। অত্যাবশ্যক কথা কি? না, আমার বস্তুগুলি ঘরে তুলিয়া রাখিও, পাখীটা যদি পড়ে তবে পড়ে যেন, গাভীটা যদি প্রসব হয় তবে প্রসব হয় যেন!—এই ত আবশ্যকীয় কথা! কথার মাথামুণ্ড কিছুই নাই; বিদায় লইয়াও এক একবার চিন্তামণিকে দেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এ দৃশ্য সুন্দর ও স্বাভাবিক। কিন্তু প্রেম-কলহের অবতারণা কি জন্য, তাহা আমরা বুঝিলাম না। স্বর্গীয় পবিত্র প্রেমে কি মান-অভিমান আছে? মান থাকিলে প্রেম অকৃত্রিম হইতে পারে না। বিল্বমঙ্গলের অভিমানের ছবি দেখাইয়া নাটককার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহাকে আকাশ হইতে এই অপবিত্র পৃথিবীতে টানিয়া আনিয়াছেন। বারাঙ্গনা-সহবাসের ফলে এই অভিমান ও প্রেম-কলহের উৎপত্তি ভিন্ন আর কি বলিব?

গিরিশবাবু আর এক চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণি-প্রেমকে বড় নিকৃষ্ট অঙ্গের প্রেম বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, স্বর্গের প্রেমে পার্থিব উপকরণ মিশ্রিত করিয়াছেন। সে চিত্র বিল্বমঙ্গলের ঈর্ষাপরতন্ত্রতা, প্রেমের বিনিময়-কামনা, প্রেমরাজ্যে বণিকের বাণিজ্য। গিরিশবাবু দেখাইয়াছেন যে, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির ভালবাসায় সন্দেহ করিয়া অন্য কেহ তাহার প্রণয়পাত্র কি না জানিবার জন্য একজন ভিক্ষুককে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন। স্বর্গের প্রণয়ে এ চিত্র বড় অস্বাভাবিক, বড় অসঙ্গত; ইহা স্বার্থপরের প্রেম, ইহা বণিকের ব্যবসা। প্রেমে ঈর্ষা নাই, সন্দেহ নাই, বিনিময় নাই, স্বার্থপরতা নাই। আমি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া যে তুমিও আমাকে ভালবাসিবে, এ কোন্ দেশী প্রেম? ইংরাজী প্রেম, যাহা প্রণয়কে ঈর্ষা-পরবশ ("Love is jealous") বলে, তাহার প্রকৃতি এবম্প্রকার হইতে পারে; কিন্তু স্বর্গীয় পবিত্র প্রেমের প্রকৃতি এমন নহে। তাহার প্রকৃতি এই যে, তুমি সহস্র ব্যক্তিকে ভালবাস না কেন, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,

আমি কেবল তোমাকে ভালবাসিয়াই সুখী। আমি তোমাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও আমাকে ভালবাসিবে,—এমন আবদার নিঃস্বার্থ প্রেমের লক্ষণ নহে। যত-ইচ্ছা তোমার প্রণয়পাত্র থাকু না কেন, আমি যেন তোমাকে ভালবাসিতে পাই, ইহাই প্রেমের মূলমন্ত্র হইলে প্রেমের পবিত্রতা রক্ষা হয়। কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত রাধিকা এ কথা বলিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি পূর্ণমাত্রায় প্রেম-রাধিকা, প্রেমময়ী রাধিকা। তিনি বলিয়াছিলেন—

"তোমার(ও) অনেক(ও) আছে,
আমার কেবল তুমি হে।"

যে দিবস প্রাতে চিন্তামণির নিকট বিদায় লইয়া গেলেন, সেই দিবসেই বিল্বমঙ্গলের পিতৃশ্রাদ্ধ। কিন্তু তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ হইল না। তিনি কুশ ফেলিয়া কোশা-কুশী ছাড়িয়া খোলা-ডোঙ্গার উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; পিণ্ড ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, শ্রাদ্ধ পণ্ড হইল; এত বড় গুরুকর্ত্তব্য প্রেমের নিকট পরাস্ত হইল। পুরোহিত-ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সকলে অবাক্, আত্মীয়-বন্ধু স্তম্ভিত; যে পারিল, সেই নিষেধ করিল; কিন্তু বিল্বমঙ্গলের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই নড়িল না, হিমাচলের ন্যায় অচল রহিল। তাঁহার প্রেমরজ্জুতে সজোরে টান পড়িল, আর কি তিনি চিন্তামণি-ছাড়া হইয়া স্থির থাকিতে পারেন? দেবোপম-ব্রাহ্মণভোজন সমাপ্ত না হইতেই চিন্তামণির জন্য উৎকৃষ্ট ভোজ্যসামগ্রীর অগ্রভাগ সংগ্রহ করিয়া উন্মত্তভাবে চিন্তামণির উদ্দেশে ছুটিলেন। ইতিপূর্ব্বে চিন্তামণি কিছু অর্থ চাহিয়াছিল; যাইবার সময় দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাঁহাকে দুই-এক দিনের মধ্যে তাহা সংগ্রহ করিবার আদেশ দিয়া বাটীর সীমা অতিক্রম করিলেন।

এ দিকে প্রলয়বেগে ঝড়-তুফান উঠিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, গাঢ়-অন্ধকারের কোলে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। বিল্বমঙ্গল পার হইবার জন্য নদীর কূলে কূলে পাঁচ সাত ক্রোশ ছুটাছুটি করিলেন; কোথাও নৌকা নাই, কেহ তাঁহাকে পার করিল না, পার হইবার কোন সুযোগই দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে ভয়ঙ্কর ভীমনাদে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল, ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, শন্-শন্ শব্দে ঝড় বহিল, বড় বড় বৃক্ষসকল সমূলে উৎপাটিত হইয়া মড়মড়-শব্দে পড়িতে লাগিল, নদীর বিশাল বক্ষে পর্ব্বতাকার তরঙ্গ উঠিল, প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল, প্রকৃতি এক ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন সৃষ্টি রসাতলে দিতে কৃতসংকল্প হইল। এ সকলের

কিছুতেই বিল্বমঙ্গলের ভ্রূক্ষেপ নাই, চিন্তামণির চিন্তায় তিনি এমনিই বিভোর যে, এ সকল গণনার মধ্যেই আসিল না। যত ঝড়-বৃষ্টি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি চিন্তামণির জন্য ততই অধিকতর ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। পার হইবার কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহার চিন্তামণি-লালসা সহস্রগুণে উথলিয়া উঠিল; আর জীবনের মমতা রহিল না, চিন্তামণি-প্রেমে আত্মত্ব ডুবিল, সন্তরণে পার হইবার আশায় বিশাল তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই; কেবল মনে, মুখে, ধ্যানে, জ্ঞানে—সেই চিন্তামণি। যাহা মানুষে পারে না, যাহা করিতে উন্মাদেরও হৃদয় কাঁপে, বিল্বমঙ্গল অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিলেন;—চিন্তামণির জন্য প্রাণদানে সমুদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ গেল না। প্রেমের জন্য প্রাণ দিতে সমুদ্যত হইলে প্রাণ যায় না,—প্রেমেই তাহা রক্ষিত হয়। প্রেমের নিকট অগ্নি নিবিয়া যায়, জল শুকায়, শিলা জলে ভাসে, হলাহল অমৃত হয়, হিংস্র জন্তুর স্বভাব ফিরে;—প্রহ্লাদ তাহা দেখাইয়াছেন। নাটককারের অদ্ভুত সৃষ্টি পাগলিনী এ সকল কথা বিল্বমঙ্গলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। ঘোর অন্ধকার, তাহাতে নদীবক্ষে উত্তাল তরঙ্গ, প্রবল ঝড়, ভয়ঙ্কর বৃষ্টি; অবলম্বন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি কি একটা অবলম্বনে ভর করিয়া বিল্বমঙ্গল নদী পার হইলেন। যখন পার হইলেন, তখনও ঝড়বৃষ্টি থামে নাই, অন্ধকার কমে নাই; রাত্রি অনেক হইয়াছে, চিন্তামণি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। সে এ প্রেমের কি ধার ধারে? যদি ধারিত, তাহা হইলে মধ্যনদীতে উভয়ের সাক্ষাৎ হইত।

বিল্বমঙ্গল অনেক কষ্টে চিন্তামণির বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, বাটীপ্রবেশের কোন উপায় নাই। কোন অবলম্বন আছে কি না, হস্তমার্জ্জনদ্বারা দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে কি একটা রজ্জুবৎ তাঁহার আসাড় হাতে ঠেকিল। তাহাই ধরিয়া তিনি প্রাচীরে উঠিয়া তথা হইতে লম্ফত্যাগে বাটীর ভিতরে পড়িলেন। চিন্তামণির নিদ্রাভঙ্গ হইল, চৈতন্যহীন বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। ক্ষণমধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিয়া সেই দুর্য্যোগের সময় কি প্রকারে নদীপার হইয়া রুদ্ধ-দ্বার-বাটী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। বিল্বমঙ্গল বলিলেন যে, একখানা কাষ্ঠ ধরিয়া নদীপার হইয়াছেন এবং প্রাচীরস্থিত রজ্জু-অবলম্বনে প্রাচীর-উল্লঙ্ঘনে সমর্থ হইয়াছেন। চিন্তা-

মনির সন্দেহ হইল, তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইল না, সে রজ্জু দেখিতে চাহিল। তখন ঝড়বৃষ্টির তেজ কতক থামিয়াছে, আলো আলিয়া চিন্তামণি বাহিরে আসিল, বিল্বমঙ্গল রজ্জু দেখাইলেন। রজ্জু দেখিয়া চিন্তামণির অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, হস্ত হইতে প্রদীপ পড়িয়া গেল; যাহা দেখিল, তাহা রজ্জু নহে—প্রকাণ্ড একটা বিষধর সর্প। চিন্তামণি তখন অধিকতর বিস্মিত হইয়া সেই কাষ্ঠখণ্ড দেখিতে চাহিল; বিল্বমঙ্গল তাহাকে সেই রণমুখী নদীতীরে লইয়া গিয়া যাহা দেখাইলেন, তাহা একটা গলিত দুর্গন্ধময় শব। চিন্তামণির আর অবিশ্বাস রহিল না, তাহার প্রেমশিক্ষা হইল, সে বিল্বমঙ্গলকে চিনিল। প্রেমের গভীরতা ও চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়া বিল্বমঙ্গলকে বলিল, "আমি বেশ্যা—আমি পর, এ সংসারে কেবল হরিই আপনার; যে মন তুমি আমাকে দিয়াছ, তাহা হরিপদে দিলে তোমার মোক্ষলাভ হইত।" বেশ্যার কথায় বিল্বমঙ্গলের চক্ষু খুলিল, তাঁহার দিব্যজ্ঞান হইল, শুষ্ক-ইন্ধনে অগ্নিসংযোগ হইল,—সেই মুহূর্ত্ত হইতে হরিই তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইল। যে প্রেম এতদিন চিন্তামণিতে আবদ্ধ ছিল, তাহা নূতন পথে প্রবাহিত হইল।

বিল্বমঙ্গল সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, বিষয়সম্পত্তি, আত্মীয়স্বজন সকলকে ত্যাগ করিলেন, চিন্তামণিকেও ভুলিলেন। এত ত্যাগস্বীকার না করিতে পারিলে কি প্রেমময়ের সাক্ষাৎ মিলে? শাক্যসিংহ কি সহজে বুদ্ধদেব? ত্যাগস্বীকারের নামই পুরুষার্থ। তিনি আসক্তিরহিত সন্ন্যাসী হইয়া হরিদর্শনের কামনায় নির্গত হইলেন। কেবল হরিধ্যান, হরিজ্ঞান; মুখে অবিরাম হরিধ্বনি। এততেও তাঁহার পূর্ব্বস্বভাব তিরোহিত হয় নাই। একদিন অহল্যা-নাম্নী এক রূপবতী বণিকপত্নীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, তাঁহার মনে পাপচিন্তার উদয় হইল; নয়নদ্বয় উৎপাটন করিলেন, অন্ধ হইলেন।

বিল্বমঙ্গল অন্ধ হইয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনে বনে ফিরিতে লাগিলেন; আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল অন্তরে হরিধ্যান, মুখে হরিনাম,—যত প্রাণ কাঁদে, ততই হরিকে ডাকেন। বনে কে তাঁহাকে আহার যোগাইবে? কে পথ দেখাইবে? কে তাঁহার ব্যাকুল হৃদয়কে শীতল করিবে? এক রাখালবালক তাঁহার সহায় ও সখা হইল। সেই বালকের প্রণয়ে বিল্বমঙ্গল ক্রমে এত মগ্ন হইলেন যে, তাহাকে চাহেন কি কৃষ্ণকে চাহেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। রাখালবালক প্রেমের ভরে তাঁহার হাত

ধরিয়া লইয়া বেড়ায়, সুধার সময় আহার দেয়, রৌদ্র হইতে তাঁহাকে ছায়ায় লইয়া বসায়। বালক যখন দেখিল যে, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণচিন্তা কিছুতেই যাইবার নহে, তখন তাঁহাকে বলিল যে, বৃন্দাবনে গেলে কৃষ্ণদর্শন লাভ হইবে। বিল্বমঙ্গল তাহার কথায় বৃন্দাবনে গেলেন; কিন্তু কৃষ্ণদর্শন ঘটে না, কেবল রাখালবালক নিকটে থাকে। বিল্বমঙ্গল শেষে রাখালবালকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন; সাত দিন কিছু আহার করিলেন না; রাখালবালকও পশ্চাতে পশ্চাতে দুধের বাটী লইয়া অবিশ্রান্ত ফিরিতে লাগিল। রাখালে কৃষ্ণে বিল্বমঙ্গলের আর ভেদজ্ঞান রহিল না, কৃষ্ণধ্যানে নিমগ্ন হইলেই রাখালবালককে দেখেন, কৃষ্ণনাম করিতে তাঁহার মুখ হইতে রাখালনাম বাহির হইয়া পড়ে। বিল্বমঙ্গল রাখালবালককে চিনিলেন, রাখালবালক কৃষ্ণমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখা দিলেন।

হইতে পারে, ইহা গল্প এবং বিশুদ্ধরুচি-মধুমোদিত গল্পও নহে। কিন্তু এ গল্পের উপদেশ অতি গভীর। গল্পটা পুরাতনও খুব; গিরিশবাবু গল্পটা গাইয়াছেন মাত্র। লোকে যে গল্পটা গিরিশবাবুর ভাবে, সেটা ভুল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

---

* শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে "শ্রীবিল্বমঙ্গল মহাশয়" আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার "সুচরিত্র" ভক্তমালে এত অসাধারণ সরলভাবে বর্ণিত যে, তন্দ্বারা তাঁহার আখ্যায়িকার অশ্লীলতা এখন একরূপ বিধৌত হইয়া গিয়াছে। বিল্বমঙ্গল আমাদের বাজারের বিলাতী বসন পরিধান করিয়া যে আধ-বাবু-আধ-বিপ্র-গোছের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সে মূর্ত্তি-অপেক্ষা ভক্তমালে বর্ণিত তাঁহার পূর্ব্বতন মূর্ত্তি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী;—অন্তত আমাদিগের এইরূপ বিবেচনা। চিন্তামণিকে এক্ষণে আমরা যেরূপ চিত্রিত দেখিতেছি, ভক্তমালে কিন্তু সেরূপ নহে। চিন্তামণি বেশ্যা বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-বিল্বমঙ্গলের রক্ষাকর্ত্রী, প্রথম ও প্রধানকল্পে তাঁহার ধর্ম্ম-পথ-প্রবর্ত্তিকা। চিন্তামণি বেশ্যাবৎ পাষাণহৃদয়া অপ্রেমিকাও নহে,—কর্ম্ম-কাণ্ড-জ্ঞান-বিবার্জ্জিতাও নহে।

দক্ষিণদেশে "কৃষ্ণবেণ্না"-নদী-তীরবর্ত্তী গ্রামে বিপ্র-বিল্বমঙ্গলের বাস। বিল্বমঙ্গল "লম্পট স্বভাব" এবং "ধর্ম্ম-অংশে অতি ক্ষিপ্র"।

'নদীপারে এক বেশ্যা, নামে চিন্তামণি,
তাহাতে আসক্ত সদা দিবসরজনী।'

কিন্তু এই বেশ্যা বিল্বমঙ্গলকে উপদেশ ও সৎপরামর্শ দেয়।

'এক দিন বিপ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ মৃতাতিথি;
বেশ্যা কহে, নদীপারে নাই আইসহ ইথি।'

বেশ্যা জানে, পিতৃশ্রাদ্ধের পর নদীপার হইতে নাই। বিল্বমঙ্গলকে সে বিষয়ে নিষেধ করিল। পরন্তু

'আমি বেশ্যা, নীচ অতি, অস্পৃশ্য, নিন্দিত,
তা'তেতু বিপ্র মোরে ক্রীড়া অনুচিত!
এ-হেন অগ্রাহ্য-কর্ম্মে হেন অনুরাগ!
ইহার যে শত-অংশ-অংশের একভাগ
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যদি হইত তোমার,
তবে কি না হইত চতুর্ব্বর্গ সেবে যার?'

ইহা চিন্তামণির "চিন্তামণি-বাক্য"। এই বাক্য শুনিয়া

'* * বিল্বমঙ্গলের লাগে হৈল সখ্য।'

তার পর যখন বিল্বমঙ্গল "পরমার্থ-লাভ" করিয়াছেন, তখন চিন্তামণি যাইয়া সাক্ষাৎ করিলে মঙ্গল-গোঁসাই তাহাকে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য আহার করিতে দিলেন। কিন্তু চিন্তামণি

'কহে মুঞি, খাইতে তোমার ঠাঞি, নাহি আইল,
আইল অর্থ হেরি।
* * * *
চিন্তামণি কহে, 'মুঞি, আর কিছু নাহি চাই,
কৃষ্ণ মোরে দেখাহ বিরলে।'

অতঃপর বিল্বমঙ্গল-সম্বন্ধে এককথা। শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে অন্ধ বিল্বমঙ্গল গোপ-বালক-বেশ-ধারী ভগবানকে সামান্য "রাখাল" বলিয়া মনে করেন নাই; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই হৃদয়ে তাঁহাকে অনুভব করিয়াছিলেন এবং মানসচক্ষে চিনিয়াছিলেন। গোপশিশু আহার্য্য আনিয়া বিল্বমঙ্গলকে বলিতেছেন, "এই লও আহার কর"। অন্ধ উত্তর করিতেছেন, "কই খাদ্য, কই তুমি, কিছু ত দেখিতে পাইতেছি না; আরও সরিয়া আইস"। শিশু হাতটী বিল্বমঙ্গলের দিকে একটু সরাইলেন,

'পুনঃ কিছু হাত বাড়াইলা ভঙ্গী করি,
সাপটিয়া ধরে সাধু অতি দ্রুত করি।'

পর্শ-মণি পাইলে, দীর্ঘকালের ক্ষুধার্থ সুধারাশি পাইলে—যেরূপ
অনুভব করে, অন্ধ বিল্বমঙ্গল শিশুর হাতখানি জড়াইয়া ধরিয়া তাহার
পেক্ষা অনেক অধিক আনন্দলাভ করিলেন। কিন্তু

'কৃষ্ণ কহে, ছাড় মোরে, মুঞি ঘরে যাই,
কি কারণে ধর মোরে, কহ ওরে ভাই!'

কিছুতেই হাত ছাড়িবেন না;

'তেঁই কহে হেন হস্ত ছাড়িতে না পারি।
ধরিয়া রাখিব আজি হৃদয়-মাঝারি!
পাইয়াছি যদি, ছাড়ি দিব কি কারণ?'

"আমার বড় বেদনা লাগিতেছে।" অন্ধ "চমকিয়া" হস্ত
করিলেন। ক্রীড়াশীল কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ হাতটী টানিয়া লইয়া
দাঁড়াইলেন। কি সুন্দর কৌতুক! কিন্তু অত্যন্ত সত্য।
সি! কোনক্রমে যেন "হস্ত শ্লথ" না হয়। হাতটী 'শল'
তখনি মাণিক পড়িয়া গিয়াছে! সাবধান! ভগবান বড়ই

'যে হেতুক হস্ত শ্লথ পাই পলাইলা,
ফাঁফর হইয়া সাধু কহিতে লাগিলা,—'

তে লাগিলেন,

'এ বড় আশ্চর্য্য নহে, হাত ছাড়ি' গেলা।
হৃদয় হইতে যদি পারহ যাইতে,
তবে ত জানিয়ে মুঞি, পৌরুষ তোমাতে।'

অর্থাৎ

'হস্ত-নিক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং?
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে!'

এই ভাবটী এবং এই ভাবের এই উক্তিটী যে কি মধুর, কি মনোহর, তাহা কেবল অনুভবনীয়।

মালঞ্চ-সম্পাদক।